প্রত্যাশা

একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

- **মহানবী (সা.)-এর নিষ্পাপত্ব সংক্রান্ত কতিপয় আয়াত**
  সংকলন : মো. আশিফুর রহমান
- **পবিত্র কোরআন ও হাদিসের দৃষ্টিতে শাফায়াত**
- **আল-কোরআনে গাদীরের ঐতিহাসিক ঘোষণা**
  অধ্যাপক আবদুল মাজিদ যাহাদাত
- **আহলে বাইতের অনুসারীদের সম্পর্কে আহলে সুন্নাতের আলেমদের অভিমত**
  আহমাদ খমেইয়ার
- **জিহাদ ও হিজরত**
  সংকলন : মিকদাদ আহমেদ
- **ইমাম মাহদী (আ.) ও মাহদাভীয়াত**
  সংকলন : মো. আশিফুর রহমান
- **ইসলাম ও আধুনিকতাবাদ**
  ডক্টর আবদুল হোসাইন খসরুপানাহ
- **শিশু-কিশোর ও যুবকদের প্রতি মহানবী (সা.)-এর আচরণ**
  মুহাম্মাদ আলী চানারানী
- **ইয়েমেনে সৌদি জোটের অব্যাহত গণহত্যা ও অবরোধ : কোথায় জাগ্রত মুসলিম ও বিশ্ববিবেক?**
  এম এ হুসাইন

বর্ষ ৮, সংখ্যা ৩-৪, অক্টোবর ২০১৮ - মার্চ ২০১৯

بسم الله الرحمان الرحيم

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু

আল্লাহ্‌র নামে

প্রত্যাশা

একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ৮, সংখ্যা ৩-৪

অক্টোবর ২০১৮- মার্চ ২০১৯

সম্পাদক : **এ. কে. এম. আনোয়ারুল কবীর**

সহযোগী সম্পাদক : **ড. জহির উদ্দিন মাহমুদ**

নির্বাহী সম্পাদক : **মো. আশিফুর রহমান**

উপদেষ্টামণ্ডলী : মোহাম্মদ মুনীর হুসাইন খান

আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

এস.এম. আশেক ইয়ামিন

প্রকাশক : মো. আশিকুর রহমান

প্রকাশকাল : বৈশাখ-আশ্বিন ১৪২৫

শাবান ১৪৩৯-মুহররম ১৪৪০

মূল্য : ১২০ (একশ বিশ) টাকা

যোগাযোগের ঠিকানা : বাড়ি # বি-৭, ফ্ল্যাট ২০১,

মানসী লেকভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, শাইনপুকুর, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬

মোবাইল : ০১৯১২১৪৫৯৬৫

Prottasha (Vol. 8, No. 3-4, October 2018-March 2019), Editor: A.K.M. Anwarul Kabir; Associate Editor: Dr. Zahiruddin Mahmud; Executive Editor: Md. Asifur Rahman; Advisors: Mohammad Munir Hossain Khan, Mohammad Abdul Quddus Badsha, S.M. Asheque Yamin; Publisher: Md. Ashiqur Rahman;

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়**

কোন মুসলমানকে কাফের বলা মহা অন্যায় ৭

- **ধর্ম ও দর্শন**

মহানবী (সা.)-এর নিষ্পাপত্ব সংক্রান্ত কতিপয় আয়াত ১৫

সংকলন : মো. আশিফুর রহমান

পবিত্র কোরআন ও হাদিসের দৃষ্টিতে শাফায়াত ৩৪

আল-কোরআনে গাদীরের ঐতিহাসিক ঘোষণা ৫৬

অধ্যাপক আবদুল মাজিদ যাহাদাত

আহলে বাইতের অনুসারীদের সম্পর্কে আহলে সুন্নাতের আলেমদের অভিমত ৭২

আহমাদ খমেইয়ার

জিহাদ ও হিজরত ৮০

সংকলন : মিকদাদ আহমেদ

ইমাম মাহদী (আ.) ও মাহদাভীয়াত ৯৭

সংকলন : মো. আশিফুর রহমান

ইসলাম ও আধুনিকতাবাদ ১২৩

ডক্টর আবদুল হোসাইন খসরুপানাহ

শিশু-কিশোর ও যুবকদের প্রতি মহানবী (সা.)-এর আচরণ ১৩২

মুহাম্মাদ আলী চানারানী

- **সাম্প্রতিক বিশ্ব**

ইয়েমেনে সৌদি জোটের অব্যাহত গণহত্যা ও অবরোধ : কোথায় জাগ্রত মুসলিম ও বিশ্ববিবেক? ১৫১

এম এ হুসাইন

Prottasha

A Quarterly Journal of Human Development
Vol. 8, No.3-4, October 2018- March 2019

Table of Contents

- **Editorial**

  It is a Great Sin to Call a Muslim 'Kafir' **7**

- **Theology and Philosophy**

  Some Verses of the Holy Quran about the Infallibility of Prophet (sm.) **15**
  Compilation: Md. Asifur Rahman

  'Shafayat' in View of the Holy Quran and Hadith **34**

  Historical Announcement of Gadir in the Holy Quran **56**
  Professor Abdul Majid Jahadat

  Opinions of Scholars of Ahle Sunnah about the Followers of Ahlul Bayt **72**
  Ahmed Khomeir

  Jihad and Hizrat **80**
  Compilation: Miqdad Ahmed

  Imam Mahdi (A.) and Mahdaviat **97**
  Compilation: Md. Asifur Rahman

  Islam and Modernism **123**
  Dr. Abdul Hossain Khosropanah

  The Prophet's Attitude towards Children and Youth **132**
  Muhammad Ali Chanarani

- **Current World**

  Mass Killing and Embargo of Saudi Alliance in Yemen: **151**
  M A Hussain

গ্রাহক চাঁদার হার		
ডাকযোগে (পোস্টাল চার্জ সহ)	১২০ টাকা (প্রতি কপি)	২৪০ টাকা (বাৎসরিক)

ডাকযোগে পত্রিকা পেতে গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার করে নিচের ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে :

মো. আশিফুর রহমান
বাড়ি নং-বি-৭ ফ্লাট-২০১, মানসী লেকভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, শাইনপুকুর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

সম্পাদকীয়

কোন মুসলমানকে কাফের বলা মহাঅন্যায়

সম্পাদকীয়

কোন মুসলমানকে কাফের বলা মহাঅন্যায়

ইসলামের আবির্ভাবের সময় জাতি ও গোত্রসমূহ পরস্পর অপরিচিত ও বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল। আরো যথার্থ বললে তারা পরস্পর বিদ্বেষী এবং দ্বন্দ-সংঘাত ও যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। কিন্তু একত্ববাদী ধর্ম ইসলামের শিক্ষার কারণে তাদের এই পরস্পর অপরিচিতি পরিচিতিতে, দ্বন্দ-সংঘাত সহযোগিতায় এবং অনৈক্য ঐক্যে পরিণত হয়েছিল। এর ফলশ্রুতিতে একক মহান জাতি হিসেবে তারা আবির্ভূত হয়েছিল এবং এক মহান সভ্যতার জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছিল। সেই সাথে শোষক ও অত্যাচারীদের হাত হতে বিভিন্ন জাতিকে রক্ষা করেছিল এবং এই উম্মাহ বিশ্বের জাতিগুলোর কাছে সম্মানের পাত্র হয়েছিল। এর বিপরীতে অত্যাচারী ও সীমালংঘনকারীদের জন্য তারা আতঙ্ক ও চক্ষুশূল হয়েছিল।

এ সকল সফলতা কখনই অর্জিত হত না যদি না তাদের মধ্যে ঐক্য থাকত এবং ইসলামের ছায়ায় আশ্রয়গ্রহণকারী জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ও সম্প্রীতি বিরাজ করত। যদিও তারা ছিল বিভিন্ন জাতির, তাদের মধ্যে ছিল মতের ভিন্নতা, সাংস্কৃতিক পার্থক্য, প্রথাগত অমিল, রীতি ও আচারের বিচিত্রতা কিন্তু মৌলনীতি ও আবশ্যকীয় বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে তারা ছিল সমবিশ্বাসী ও ঐকমত্য। তারা বুঝত একতাই শক্তি আর বিভেদই দুর্বলতা।

কিন্তু বর্তমানে ইসলামী উম্মাহ তার সত্তা, বিশ্বাস ও ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নগ্ন ও কুৎসিত হামলার শিকার। তাদের শান্তিপূর্ণ মাজহাবী সহাবস্থান ও পরমতসহিষ্ণুতার মধ্যে ফাটল সৃষ্টির মাধ্যমে বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়া হচ্ছে। ফলে তারা ঐক্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কঠিন আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে। এ সকল আক্রমণ দ্রুত তার পরিণতি ও মন্দ ফল বয়ে আনছে। এ মুহূর্তে তাদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত কি এটি হওয়া উচিত নয় যে, তারা সংঘবদ্ধভাবে পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে ও তাদের মধ্যকার সম্পর্ককে মজবুত ও দৃঢ় করবে। তাদের বুঝতে হবে তাদের মধ্যে মাজহাব ও ফিরকাগত মতপার্থক্য থাকলেও ধর্মীয় উৎসের দিক থেকে তারা এক কোরআন ও সুন্নাহর অনুসারী, তওহীদ, নবুওয়াত ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তারা সমবিশ্বাসী, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, জিহাদ, হালাল, হারাম প্রভৃতি বিষয়ে এক শরীয়তের অনুবর্তী।

দুঃখজনকভাবে অধুনা মুসলমানদের মধ্যে এমন চিন্তার ব্যক্তিদের উদ্ভব ঘটেছে যারা নিজেদের মনগড়া বিশ্বাসের ভিত্তিতে মুসলমানদের কাফের ও তাদের রক্ত ঝরানোকে জায়েয বলে ফতওয়া দিচ্ছে। অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন : হে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য) সফর কর তখন প্রথমে অনুসন্ধান কর এবং (সাবধান থেক!) যে কেউ (ইসলাম প্রকাশের জন্য) তোমাদের সালাম করে, তাকে এ কথা বল না যে, 'তুমি মুমিন নও', এ অবস্থায় যে, তোমরা ইহকালের ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য উপকরণের বাসনা কর, অথচ আল্লাহর কাছে অফুরন্ত সম্পদ রয়েছে। (হে মুসলমানগণ!) তোমরাও ইতঃপূর্বে এমনই (মুশরিক) ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছিলেন (ফলে তোমরা মুসলমান হয়েছো), সুতরাং (পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে) উত্তমরূপে তদন্ত করে দেখ; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত।(সূরা নিসা:৯৪)

মুসলমান কে সেসম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন, 'ইসলাম পাঁচ বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে : এ সাক্ষ্য দান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই ও মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সকল কিছুকে স্বীকার করা, এ পথে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানো... (মুসলমান হিসাবে) এর মধ্যে রাসূলের নবুওয়াতের সূচনা থেকে শেষ ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তি পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত।...সুতরাং যাদের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য থাকবে গুনাহের কারণে তাদের কাফের প্রতিপন্ন করো না এবং তাদের ব্যাপারে শিরক করেছে বলে সাক্ষ্য প্রদান করো না। (কানযুল উম্মাল, ২য় খণ্ড, পৃ.২৯, হাদিস নং৩০)

মহানবি (সা.) যখন মুয়ায ইবনে জাবালকে ইয়েমেনে প্রেরণ করেন তখন তাকে বলেছিলেন: অমুসলমানদের কলেমা শাহাদাতের দিকে আহ্বান কর যদি তারা এর সাক্ষ্য প্রদান করে, অতঃপর পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ আদায় করে ও যাকাত দিতে সম্মত হয় তখন তাদের জীবন ও সম্পদের অধিকারকে নষ্ট হতে দিও না। (সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ.১৫৮, সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ.১৫০,দারু ইহইয়াউ তুরাসিল আরাবি, লেবানন)

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে হযরত আলী খায়বারের যুদ্ধে রাসূল (সা.) কে প্রশ্ন করেন : আমি কতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখব? তিনি (সা.) বলেন: যখন তারা কলেমা শাহাদাত পাঠ করবে তখন তাদের রক্ত ঝরানো নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। (সহীহ মুসলিম, ৪র্থ খণ্ড, বাবু ফাযায়িলি আলী, পৃ.১৮৭১, দারু ইহইয়াউ তুরাসিল আরাবি, লেবানন)

সুতরাং যে কেউ ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করবে তার জীবন, সম্পদ, সম্মান সবই নিরাপত্তা লাভ করবে। আর এটা প্রমাণিত হওয়ার জন্য মৌখিক সাক্ষ্যই যথেষ্ট। কেননা আত্মিকভাবে ঈমান আনা ও তা দৃঢ় হওয়ার জন্য যে জ্ঞান ও মারেফাতের

প্রয়োজন তার জন্য পরিবেশ ও সময় প্রয়োজন। তাই বাহ্যিকভাবে কেউ এটুকু স্বীকার করলেই তার জীবন, সম্ভ্রম ও সম্পদ সম্মানিত বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে যদিও সে ইসলামের বিশ্বাসের খুটিনাটি দিকসমূহ, বিধান ও নীতিমালার সাথে পূর্ণ পরিচিতি লাভ করেনি ও তার প্রতি আমল করেনি তবুও সে মুসলমান বলে গণ্য। যদি এসব বিষয়ে জানার ক্ষেত্রে কেউ অবহেলা করে তবে সে আল্লাহর কাছে অভিযুক্ত হবে কিন্তু তাকে কাফের বলার কোন সুযোগ নেই।

এমনকি কোন কোন হাদিসে স্বয়ং আল্লাহর রাসূলের (রা.) কাজকে প্রশ্নের সম্মুখীন করা সত্ত্বেও শুধু এ সম্ভাবনার ভিত্তিতে যে, সমালোচক ব্যক্তি নামাজ পড়ে তিনি (সা.) তাকে হত্যা করতে নিষেধ করেন। (সহীহ বুখারী, ৫ম খণ্ড, পৃ.২০৭, ইহইয়াউত তুরাস প্রকাশনা, বৈরুত)

মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ তার 'সহীহ' গ্রন্থে ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন: যখন কোন ব্যক্তি তার মুমিন ভাইকে কাফের বলে, অবশ্যই তাদের একজন কাফের বলে গণ্য হয়। (সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬, বাবু মান ক্বলা লিআখিহী ইয়া কাফির, কিতাবুল ঈমান)

একারণেই প্রসিদ্ধ আলেমরা এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। আল্লামা তাকিউদ্দিন সুবকি এ সম্পর্কে বলেছেন: অন্তরে বিশ্বাস পোষণ করে এমন কোন মুমিনকে কাফের প্রতিপন্ন করার কাজটি খুবই কঠিন। যদি সে মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলে কিন্তু বাহ্যিকভাবে তাকে বেদআতি কাজ ও প্রবৃত্তির অনুসরণে কিছু করতে দেখা যায় তবুও তাকে কাফের বলা বেশ কঠিন বিষয়। কারণ কাউকে কাফের বলা বড় বিপদজনক এক কাজ। (শা'রানী, আলইয়াকীত ওয়াল জাওয়াহির, ২য় খণ্ড, পৃ.১২৫)

ইবনে হাযম বলেন: আলেমদের একদল এ বিশ্বাস পোষণ করেন যে, কোন মুসলমানকে তার দেয়া কোন ফতওয়া বা বিশ্বাসের কারণে (কোন অবস্থাতেই) ফাসেক বা কাফের বলা উচিত নয়।(ইবনে হাযম, আলফাছল, ৩য় খণ্ড, পৃ.২৯১)

কারণ কেউ মুসলমান বলে গণ্য হওয়ার জন্য ইসলাম ন্যূনতম কিছু শর্ত দিয়েছে যা কারো মধ্যে থাকলে অবশ্যই সে মুসলমান বলে পরিগণিত হবে। যেমন, পবিত্র কোরআন মরুবাসী আরবদের পূর্ণ মুমিন বলে স্বীকৃতি না দিলেও মুসলমান হিসাবে তাদের গ্রহণ করে বলেছে: মরুবাসীরা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি', (হে নবি) আপনি বলুন, 'তোমরা ঈমান আননি (বিশ্বাস স্থাপন করনি); কিন্তু এ কথা বল যে, 'আমরা আত্মসমর্পণ করেছি'; কারণ, এখনও তোমাদের হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ করেনি। যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তিনি তোমাদের কর্মসমূহ হতে কিছুই হ্রাস করবেন না; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, অনন্ত করুণাময়।(হুজুরাত:১৪)

এর পরবর্তী আয়াতে পূর্ণ ঈমানের অধিকারীদের বর্ণনা দিয়ে কোরআন বলেছে: নিশ্চয় মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর কখনও সন্দেহ পোষণ করেনি এবং আল্লাহর পথে তাদের ধন-সম্পদ দ্বারা ও তাদের জীবন দ্বারা জিহাদ করেছে; প্রকৃতপক্ষে তারাই হল (তাদের বিশ্বাসের দাবিতে) সত্যবাদী। (হুজুরাত:১৫)

মহানবি (সা.) জীবরাঈল (আ.) থেকে বর্ণনা করেছেন: ইসলাম হল আল্লাহর একত্বের এবং মুহাম্মাদ (সা.) এর রেসলালাতের শাহাদাত (সাক্ষ্য দান)।(সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং.১২৬১০; সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং৪৬৯৫; সুনানে নাসাঈ, হাদিস নং৪৯৯০) ইবনে উমর তাঁর পিতা হযরত উমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মুসাফির বলে দাবিকারী এক অজ্ঞাত সুশ্রী ব্যক্তি রাসূলের (সা.) সমীপে এসে তার হাঁটু রাসূলের হাঁটুর সাথে সংযুক্ত করে নিজের দুটি হাত স্বীয় উরুর ওপর রেখে ইসলাম কী তা জানতে চাইলে তিনি (সা.) বললেন: ইসলাম হল তুমি আল্লাহর একত্বের এবং মুহাম্মাদ (সা.) এর রেসলালাতের শাহাদাত (সাক্ষ্য) দান করবে, নামাহ কায়েম ও যাকাত আদায় করবে, রমজান মাসে রোযা রাখবে এবং (আর্থিক ও শারীরিকভাবে) সক্ষম হলে হজ করবে।(সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ.২৯; সুনানে নাসাঈ, ৮ম খণ্ড, পৃ.৯৮; বাইহাকি, সুনানে কুবরা,৪র্থ খণ্ড, পৃ.৩২৫; কানযুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃ.২৭০)

ইমাম সাদিক (আ.) ইসলাম সম্পর্কে বলেন: ইসলাম হল আল্লাহর একত্বের ও তাঁর রাসূলের রেসালাতের সাক্ষ্য প্রদান। এর মাধ্যমে রক্ত ও জীবন সম্মানিত ও তা রক্ষা অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে বিয়ে বৈধ ও ইসলামী আইনে উত্তরাধিকার বন্টন কার্যকর হয়। সামাজিকভাবে এরা মুসলিম জনগোষ্ঠী বলে পরিগণিত হবে। (উসুলে বাফি, ২য় খণ্ড, পৃ.২০, নাশরু মাতবায়াতিল ইসলামিয়া তেহরান, ১৩৮৮হি)

তবে ঈমানের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। ন্যূনতম পর্যায় হল এটা। এর থেকে উপরের পর্যায় হল আল্লাহর সকল নির্দেশ, আদেশ ও নিষেধ মেনে চলা যদিও তা নিজের কামনা-বাসনার বিপরীত হয়। এ অবস্থায় ব্যক্তিকে মহানবি (সা.) শরীয়তের নির্দেশাবলী ও বিধিবিধান হিসাবে যা এনেছেন এবং বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রে যে সমাধানই নিয়েছেন তা মেনে নিতে হবে। (ইবনে মানযুর, লিসানুল আরাব,১২তম খণ্ড, পৃ.২৯৩) পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের ভিত্তিতে এর আবশ্যকতা প্রমাণিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন: যা কিছু রাসূল তোমাদের জন্য এনেছেন তা গ্রহণ কর এবং যা কিছু থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক। (সূরা হাশর:৭)

ইসলামের সর্বোচ্চ পর্যায় হল আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও বন্দেগি যা শুধু বাহ্যিকভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা নামাজ, রোজা পালন, হজ সম্পাদন ও যাকাত দান নয়, এগুলোকে নিষ্ঠার সাথে একান্তভাবে আল্লাহর জন্য করতে তো হবেই এর

পাশাপাশি আল্লাহর রাসূলের বিচার-ফয়সালাকে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে আন্তরিকভাকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিতে হবে। এর প্রতি ইঙ্গিত করেই মহান আল্লাহ বলেছেন : তোমার প্রতিপালকের কসম, তারা কখনই বিশ্বাসী হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের পারস্পরিক বিবাদে তোমাকে তাদের বিচারক করবে; অতঃপর যা তুমি মীমাংসা করবে তার প্রতি তারা তাদের অন্তরে কোন সংকীর্ণতা অনুভব করবে না এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করবে। (সূরা নিসা:৬৫)

কেউ যদি ইসলামের এ স্তরে না পৌছায় তবে তাকে কাফের বলা বৈধ নয়। এজন্যই হযরত আলী (আ.) কখনই তাঁর সঙ্গে যুদ্ধকারী প্রতিপক্ষকে কাফের বলেননি। তিনি তাঁকে কাফের প্রতিপন্নকারী খারেজী সম্প্রদায়কে শয়তানের প্রতারণায় বিচ্যুত বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু তাদের কাফের বলে অভিহিত করেননি। হযরত আলী সিরিয়ার সাধারণ যে মানুষগুলো মুয়াবিয়ার মিথ্যা প্রচারণায় প্রভাবিত হয়ে তাঁর (আ.) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিল সিফফিনের দিন তাদের সম্পর্কে বলেন: আজ ইসলামের ওপর মরিচা পড়েছে, তাতে বিকৃতি সাধিত হয়েছে, মুসলমানদের চিন্তায় (সত্য সম্পর্কে) সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে, দ্বীনের ভুল ও মিথ্যা ব্যাখ্যা প্রদান করা হচ্ছে। একারণে আমরা আমাদের মুসলমান ভাইদের সাথে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছি। যদি অনুভব করি (যুদ্ধ ব্যতীত) কোন কিছু (তাদের সংশোধিত করবে ও) আমাদের (সত্যের ওপর) ঐক্যবদ্ধ এবং পরস্পরকে নিকট করবে তবে তাই করব। (নাহজুল বালাগাহ, খুতবা:১২২)

ইমাম আলী (আ.) উক্ত বক্তব্যে ইসলামের পরিভাষায় তাদের মুসলমান হিসাবেই শুধু গণ্য করেননি, উপরন্তু তাদের 'আমাদের মুসলমান ভাই' বলে অভিহিত করেছেন। এজন্যই তিনি কখনই তার সাথে যুদ্ধকারীদের সাথে কাফেরদের ন্যায় আচরণ করেননি অর্থাৎ তাদের সাথে বিধর্মীদের ওপর প্রযোজ্য বিধান কার্যকর করেননি। জঙ্গে জামালে তিনি প্রতিপক্ষের লোকদের দাস হিসাবে বন্দী করেননি। একবার তাঁকে তাঁর সাথে যুদ্ধরত আহলে কিবলা বা একই কিবলার অনুসারীদের মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'তারা ইসলামের বিধান (অমান্য) ও ঐশী নিয়ামতের কুফরী (অস্বীকার) করেছে। কখনই তাদের কুফরী (অস্বীকার) মুশরিকদের কুফরীর মত নয় যারা নবুওয়াতকে অস্বীকার করেছিল ও ইসলামকে স্বীকৃতি দেয়নি। যদি তারা ঐরূপই হত তবে তাদের সাথে বিবাহ বৈধ হত না, তাদের জবেহকৃত মাংস হালাল হত না এবং আমরা পরস্পর থেকে উত্তরাধিকার লাভ করতাম না।'

তিনি মুসলমানদের কাফের প্রতিপন্ন করার কারণে খারেজীদের সমালোচনা করে তাদের উদ্দেশ করে বলেছেন, 'নিঃসন্দেহে তোমরা জান, আল্লাহর রাসূল (সা.) বিবাহিত ব্যক্তিকে ব্যভিচারের অপরাধে সাঙ্গসারের শাস্তি দিয়েছেন, কিন্তু তার

জানাযার নামায পড়েছেন, মুসলমান হিসাবে তার উত্তরাধিকারীদের উত্তরাধিকার দিয়েছেন। হত্যাকারীকে কিসাস করে তার উত্তাধিকারীদের মধ্যে তার পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টন করেছেন।... অবিবাহিত ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত করেছেন অতঃপর গনিমত থেকে তাকে দিয়েছেন যাতে অন্য মুসলিম নারীর সাথে সে বিবাহ করতে পারে। তিনি তাদের অপরাধের কারণে দণ্ড দেয়া সত্ত্বেও বায়তুলমাল থেকে তাদের বঞ্চিত করেননি ও ইসলামের খাতা থেকে তাদের নাম কেটে দেননি (অর্থাৎ তারা কবিরা গুনাহ করলেও তিনি (সা.) তাদের কাফের প্রতিপন্ন করেন নি)।–খুতবা : ১২৭

অতএব, কারো মধ্যে ঈমানের ঘাটতি ও ঈমানী দুর্বলতা থাকলে এবং কবিরা গুনাহ করলেও তাকে মুসলমান বলে স্বীকৃতি দিতে হবে ও কোনক্রমেই তাকে কাফের বলা যাবে না। অবশ্য এ কথার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, এরূপ ব্যক্তিদের ক্ষমতা ও পদ দেয়া যাবে এবং মুসলমানদের ওপর শাসক বানানো যাবে। কারণ এটা কোরআনের নির্দেশের সুস্পষ্ট পরিপন্থী। মহান আল্লাহ বলেন: তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের নির্দেশের অনুগত হয়ো না, যারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং (নিজেদের সংশোধন ও) সংস্কার করে না।' শোয়ারা:১৫১-১৫২) হযরত আলী নিজেই মুয়াবিয়া ও তার অনুচরদের অন্যায় কর্মের সমালোচনা ও নিন্দা করে বলেছেন: আমি এজন্য মর্মাহত যে, এ উম্মতের (ইসলামের বিধান সম্পর্কে) অজ্ঞ ও দুরাচারীরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। তারা আল্লাহর সম্পদকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে বন্টন না করে নিজেরা ভাগাভাগি করে ভোগ করছে। আর তাদের নিজেদের দাস বানিয়ে রেখেছে। এ অনাচারীরা সৎ ও পুণ্যবানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে এবং ফাসেকদের নিজেদের সংগী করেছে। (নাহজুল বালাগাহ, ৬২ নং পত্র)

সবশেষে এ দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, আজ ইসলামের শত্রুরা ইসলামকে ধ্বংস করার নিমিত্তে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির সর্বাত্মক চেষ্ট চালাচ্ছে। এজন্য তারা মোক্ষম হাতিয়ার হিসাবে মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে যাতে তারা একে অপরকে কাফের প্রতিপন্ন করে আত্মঘাতি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এক্ষেত্রে তারা অনেকটা সফলও হয়েছে। ফলে বিভিন্ন মুসলিম দেশে বিভিন্ন মাজহাব ও মতের অনুসারীদের মধ্যে বিগ্রহ দেখা দিয়েছে। এ সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য মুসলমানদের খুবই সচেতন হওয়া আবশ্যক। তাই এরূপ পরিস্থিতিতে সবার বিশেষত আলেম সমাজ ও মুসলিম চিন্তাবিদদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান হল শত্রুর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তারা যেন সজাগ হন ও তাদের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা না দেন। সেইসাথে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যেও পথে সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফিক দিন।

ধর্ম ও দর্শন

মহানবী (সা.)-এর নিষ্পাপত্ব সংক্রান্ত কতিপয় আয়াত

পবিত্র কোরআন ও হাদিসের দৃষ্টিতে শাফায়াত

আল-কোরআনে গাদীরের ঐতিহাসিক ঘোষণা

আহলে বাইতের অনুসারীদের সম্পর্কে আহলে সুন্নাতের নিরপেক্ষ আলেমদের অভিমত

জিহাদ ও হিজরত

ইমাম মাহদী (আ.) ও মাহদাভীয়াত

ইসলাম ও আধুনিকতাবাদ

শিশু-কিশোর ও যুবকদের প্রতি মহানবী (সা.)-এর আচরণ

মহানবী (সা.)-এর নিষ্পাপত্ব সংক্রান্ত কতিপয় আয়াত

সংকলন : মো. আশিফুর রহমান

পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের অপব্যাখ্যা করে মহানবী (সা.)-কে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে। আয়াতটি হলো :

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟
لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ﴿١١٠﴾

তুমি বল, '(দৈহিক দৃষ্টিতে) আমি তো তোমাদের মতোই মানুষ, (তবে আত্মিক উৎকর্ষ ও ঐশী ধারণক্ষমতার অধিকারী হওয়ার কারণে) আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, আমার ও তোমাদের উপাস্য কেবল এক অদ্বিতীয় উপাস্য।' সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাতের আশা করে সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের উপাসনায় কাউকে তাঁর অংশী না করে।– সূরা কাহাফ : ১১০

এ আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে অনেকে বলেছেন, মহানবী (সা.) যেহেতু আমাদের মতোই ছিলেন, সেক্ষেত্রে আমরা যেমন ভুল করি, তিনিও সেরকম ভুল করতেন। শুধু তাই নয়, তাঁর দ্বারা পাপকাজ সংঘটিত হওয়াও অসম্ভব নয়।

এর সপক্ষে তাঁরা পবিত্র কুরআনের কতিপয় আয়াতও উপস্থাপন করেন। যেমন সূরা আনফালের আয়াত (বদরের যুদ্ধবন্দিদের কাছ থেকে মুক্তিপণ নেয়া), সূরা আবাসার আয়াত (ভ্রু কুঞ্চিত করা), সূরা ফাতহের আয়াত (রাসূলের আগের পরের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া), সূরা তাওবার আয়াত (মুসলমানদেরকে জিহাদে অংশ নেয়া থেকে বিরত থাকার অনুমতি দান) ও আরো কয়েকটি আয়াত।

আসলেই কি মহানবী (সা.) আমাদের মতো মানুষ ছিলেন? যদি তা না হবেন তাহলে কেনই বা কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি আমাদের মতো মানুষ। নাকি এ

আয়াতের উদ্দেশ্য ভিন্ন? আর অন্য যে আয়াতগুলোর উল্লেখ করেছি সেগুলোর অর্থই বা কী?

এখন আমরা দৃষ্টি দেব পবিত্র কুরআনের দিকে। অন্য নবী-রাসূলদের ক্ষেত্রে তাঁদের সম্প্রদায় তাঁদেরকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখত? কোরআন মজীদের কয়েকটি আয়াত উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করছি।

ফিরআউন সম্প্রদায়ের কথা কোরআন মজীদে এসেছে :

فَقَالُوٓاْ أَنُؤۡمِنُ لِبَشَرَيۡنِ مِثۡلِنَا وَقَوۡمُهُمَا لَنَا عَٰبِدُونَ ﴿٤٧﴾

তারা বলল, 'আমরা কি আমাদেরই মতো দু'জন মানুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব যে ক্ষেত্রে তাদের সম্প্রদায় (স্বয়ং) আমাদের উপাসনাকারী (সেবায় নিয়োজিত)?'– সূরা মুমিনুন : ৪৭

لَاهِيَةً قُلُوبُهُمۡۗ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجۡوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلۡ هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡۖ أَفَتَأۡتُونَ ٱلسِّحۡرَ وَأَنتُمۡ تُبۡصِرُونَ ﴿٣﴾

তাদের হৃদয় আমোদ-প্রমোদে বিভোর এবং যারা অবিচার করেছে তারা নিভৃতিতে শলা-পরামর্শ করে, (এবং বলে) 'এ কি তোমাদের মতোই একজন মানুষ নয়? তবুও কি তোমরা দেখে-শুনে জাদুর জালে জড়িয়ে যাবে?'– সূরা আম্বিয়া : ৩

وَقَالَ ٱلۡمَلَأُ مِن قَوۡمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلۡأٓخِرَةِ وَأَتۡرَفۡنَٰهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡ يَأۡكُلُ مِمَّا تَأۡكُلُونَ مِنۡهُ وَيَشۡرَبُ مِمَّا تَشۡرَبُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَئِنۡ أَطَعۡتُم بَشَرٗا مِّثۡلَكُمۡ إِنَّكُمۡ إِذٗا لَّخَٰسِرُونَ ﴿٣٤﴾

(কিন্তু) তার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা যারা অবিশ্বাস করেছিল এবং পরকালের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করেছিল এবং পার্থিব জীবনে আমরা তাদের ভোগ-বিলাসের সামগ্রী দিয়েছিলাম, তারা বলল, 'এ তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ, সে তা থেকেই আহার করে যা থেকে তোমরা আহার কর, এবং সে (তা থেকেই) পান করে তোমরা

যা থেকে পান কর। (৩৪) আর যদি তোমরা তোমাদের মতো একজন মানুষের আনুগত্য কর, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।– সূরা মুমিনুন : ৩৩-৩৪

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُۥ كَانَت تَّأۡتِيهِمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ فَقَالُوٓاْ أَبَشَرٞ يَهۡدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلَّواْ وَّٱسۡتَغۡنَى ٱللَّهُۚ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٞ ٦

এটা এ কারণে যে, তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণসহ আসত, কিন্তু তারা বলত, 'মানুষ কি আমাদের পথ প্রদর্শন করবে?' বস্তুত তারা অবিশ্বাস করল ও বিমুখ হয়ে গেল; এবং আল্লাহও তাদের পরোয়া করলেন না; আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসার্হ।– সূরা তাগাবুন : ৬

সূরা ফুরকানের ২০ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলছেন :

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ مِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمۡ لَيَأۡكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمۡشُونَ فِي ٱلۡأَسۡوَاقِۗ

আমরা তোমার পূর্বে যে সকল রাসূল প্রেরণ করেছি তারা সকলেই আহারও করত এবং হাটে-বাজারে চলাফেরাও করত।

এই সাধারণ কাজকর্ম দেখে মানুষ মনে করত যে, তাদের সাথে নবী-রাসূলগণের কোন পার্থক্য নেই। তারা মনে করত যে, মানুষের পক্ষে পাপকাজের ঊর্ধ্বে ওঠা সম্ভব নয়। তারা আরো মনে করত যে, ফেরেশতাদের পক্ষেই কেবল পাপ থেকে বিরত থাকা সম্ভব এবং তাদেরকেই নবী-রাসূল করে প্রেরণ করা উচিত। মানুষকে নবী করে প্রেরণ করার বিষয়টি বরং তাদের ঈমান আনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা দিয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤۡمِنُوٓاْ إِذۡ جَآءَهُمُ ٱلۡهُدَىٰٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرٗا رَّسُولٗا ٩٤ قُل لَّوۡ كَانَ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَلَٰٓئِكَةٞ يَمۡشُونَ مُطۡمَئِنِّينَ لَنَزَّلۡنَا عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكٗا رَّسُولٗا ٩٥

(৯৪) যখন মানুষের নিকট পথনির্দেশ এল তখন এ বিষয়টি ভিন্ন আর কিছু তাদের বিশ্বাস স্থাপনে নিবৃত্ত করে নি যে, তারা বলতে লাগল, 'আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে প্রেরণ করেছেন?' (৯৫) তুমি বল, 'যদি ভূপৃষ্ঠে ফেরেশতারা প্রশান্তির সাথে বিচরণ করত, তবে আমরা তাদের ওপর আকাশ থেকে কোন ফেরেশতাই রাসূল করে অবতীর্ণ করতাম।'– সূরা বনি ইসরাইল : ৯৪

আর মুসলমানদের একটি অংশের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে সেটি হলো তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ হিসেবে মেনে নিয়েছে, তবে তাঁর সাথে যে অন্য মানুষের পার্থক্য রয়েছে এই বিষয়ে ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন কি সকল মানুষকে এক করে দেখে? কখনই নয়; বরং কুরআন মজীদের আয়াতেই আমরা মানুষে মানুষে পার্থক্যের বিষয়টি দেখতে পাই।

মহান আল্লাহ বলছেন :

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَلَا ٱلْمُسِىٓـُٔ ۚ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾

(৫৮) অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয় এবং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তারাও (প্রতিফলের দৃষ্টিতে) দুষ্কৃতিকারীদের ন্যায় হতে পারে না; তোমরা অল্পই শিক্ষা (ও উপদেশ) গ্রহণ করে থাক।– সূরা মুমিন : ৫৮

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলছেন :

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ

তুমি বল, 'যারা জানে ও যারা জানে না তারা কি পরস্পর সমান?' নিশ্চয়ই বোধশক্তিসম্পন্নরাই উপদেশ গ্রহণ করে।– সূরা যুমার : ৯

এমনকি নবী-রাসূলগণের মধ্যেও মর্যাদাগত পার্থক্য রয়েছে :

تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ ۖ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَٰتٍ ۚ

এসব রাসূল, তাদের মধ্যে কতককে আমরা কতকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে কেউ এমনও আছে যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, আর কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন।– সূরা বাকারা : ২৫৩

তাহলে 'আমি তোমাদের মতো মানুষ'– এ কথাটির অর্থ কী? কোন্ দিক থেকে এ সমকক্ষতা? জ্ঞান, চরিত্র, অন্তর্দৃষ্টি সবদিক থেকে কি মহানবী (সা.) অন্যান্য মানুষের মতো?

প্রকৃতপক্ষে এ কথাটি বলার উদ্দেশ্য হলো নবী-রাসূলগণ ফেরেশতা নন। তাঁরা আমাদের মতো রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ। যেহেতু কাফির-মুশরিকরা ভাবত যে, মানুষের বৈশিষ্ট্যই হলো ভুল ও পাপে নিপতিত হওয়া সেহেতু মানুষ কখনও নবী-রাসূল হতে পারে না। মানুষও যে ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে উঠতে পারে, এটা তারা কোনভাবেই বিশ্বাস করতে পারত না। একারণেই মহান আল্লাহ মানুষকে নবী-রাসূল হিসেবে প্রেরণ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষও সকল প্রকার ভুল-ভ্রান্তি ও পাপকাজের ঊর্ধ্বে উঠে জীবন যাপন করতে পারে।

অপরদিকে যারা বলে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এখানে মানুষ বলতে নিজেকে ভুল-ভ্রান্তিযুক্ত ও পাপে রত মানুষের মতোই বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর কর্তৃকও ভুল-ত্রুটি ও পাপকাজ সংঘটিত হতে পারে তা নিতান্তই মনগড়া। সূরা ইয়াসীনে মহান আল্লাহ মহানবী (সা.) সম্পর্কে বলছেন :

يسٓ ﴿١﴾ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴿٢﴾ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣﴾ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤﴾

(১) ইয়া-সীন। (২) প্রজ্ঞাপূর্ণ কুরআনের শপথ। (৩) নিঃসন্দেহে তুমি রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত। (৪) তুমি সরল পথে (সিরাতুল মুস্তাকীম) প্রতিষ্ঠিত।

তাই নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.) এক মুহূর্তের জন্যও সিরাতুল মুস্তাকীমের বাইরে নন। আর এ কারণেই তাঁর আনুগত্যকে মহান আল্লাহরই আনুগত্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে :

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ

'যে রাসূলের আনুগত্য করল নিঃসন্দেহে সে আল্লাহরই আনুগত্য করল।'– সূরা নিসা : ৮০

উপরন্তু তাদের মতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল না। প্রকৃতপক্ষে নবুওয়াত প্রাপ্তি ব্যতীত সাধারণ মানুষের সাথে তাঁর কি কোন পার্থক্যই ছিল না? তাহলে প্রশ্ন হলো :

১. রাসূলের ওপর কি তাহাজ্জুদ নামায ফরয় ছিল না?
২. রাসূলের জন্য কি একাধারে রোযা রাখা জায়েয ছিল না?
৩. রাসূলের জন্য কি একই সময়ে চারের অধিক স্ত্রী রাখা জায়েয ছিল না?
৪. রাসূলের জন্য কি নাপাক অপস্থায় মসজিদে প্রবেশ জায়েয ছিল?
৫. রাসূলের ইন্তেকালের পর তাঁর স্ত্রীদের সাথে অন্য কারো কি বিয়ে জায়েয ছিল?
৬. রাসূলের গুনাহের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার কি দ্বিগুণ নয়?

উপরিউক্ত বিষয়গুলো চিন্তা করলে বোঝা যায় তাঁর বৈশিষ্ট্য, তাঁর কাজ, তাঁর মর্যাদা, তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সাথে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান।

এমনকি সৃষ্টিজগতের অন্যান্য সৃষ্টিও এক নয়, এদের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। আয়াতে বলা হয়েছে :

قُل لَّا يَسۡتَوِي ٱلۡخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوۡ أَعۡجَبَكَ كَثۡرَةُ ٱلۡخَبِيثِۚ

বল, 'অপবিত্র ও পবিত্র সমান হতে পারে না, যদিও অপবিত্র বস্তুর আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে।– সূরা মায়েদা : ১০০

অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে :

وَفِي ٱلۡأَرۡضِ قِطَعٞ مُّتَجَٰوِرَٰتٞ وَجَنَّٰتٞ مِّنۡ أَعۡنَٰبٖ وَزَرۡعٞ وَنَخِيلٞ صِنۡوَانٞ وَغَيۡرُ صِنۡوَانٖ يُسۡقَىٰ بِمَآءٖ وَٰحِدٖ وَنُفَضِّلُ بَعۡضَهَا عَلَىٰ بَعۡضٖ فِي ٱلۡأُكُلِۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ ٤

এবং ভূমির বিভিন্ন খণ্ড পরস্পর সংলগ্ন; তাতে আছে আঙ্গুরের বাগান, শস্যক্ষেত এবং খেজুর গাছসমূহ– কতক দুই শিরবিশিষ্ট, কতক একশিরবিশিষ্ট, সকলকে একই পানি দ্বারা সিঞ্চন করা হয়; এবং আমরা তাদের কতককে কতকের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকি। নিশ্চয় বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে বহু নিদর্শন রয়েছে।–সূরা রাদ : ৪

অর্থাৎ পবিত্র কোরআনে এসব উদাহরণ শুধুই শুধুই দেয়া হয় নি। বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে তা উল্লেখের মাধ্যমে আমাদের জন্য চিন্তার উপকরণ জুগিয়েছেন।

বদরের যুদ্ধ বন্দিদের মুক্তিপণ সম্পর্কে

বদর যুদ্ধ ছিল কাফির-মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের প্রথম সর্বব্যাপী যুদ্ধ। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় দ্বিতীয় হিজরিতে। এ যুদ্ধে কাফির-মুশরিকদের কয়েকজন বড় নেতা যেমন আবু জেহেল, ওতবা, শাইবাসহ অনেকে নিহত হয়, কিছুসংখ্যক আহত হয় ও কিছুসংখ্যক মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়। আহলে সুন্নাতের মতে, যেসব কাফির বন্দি হয় তাদের ব্যাপারে কী করা হবে সেটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করেন। একদল (যাদের মধ্যে হযরত উমরও ছিলেন) বলে যে, তাদেরকে হত্যা করা হোক, আরেক দল বলে যে, তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হোক। মহানবী (সা.) মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। পরে মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে তিরস্কার করে ও শাস্তির ভয় দেখিয়ে আয়াত নাযিল করেন। মহান আল্লাহ বলেন :

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسۡرَىٰ حَتَّىٰ يُثۡخِنَ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنۡيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلۡأٓخِرَةَۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٦٧ لَّوۡلَا كِتَٰبٞ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمۡ فِيمَآ أَخَذۡتُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ٦٨ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمۡتُمۡ حَلَٰلٗا طَيِّبٗاۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٦٩

(৬৭) কোন নবীর পক্ষে যতক্ষণ না ভূমিতে (রণক্ষেত্রে) পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে (ততক্ষণ) বন্দি রাখা সমীচীন নয়। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা করছ, আর আল্লাহ (তোমাদের জন্য) পরকাল চাইছেন; এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৬৮) এবং আল্লাহর পক্ষ হতে যদি পূর্বেই সিদ্ধান্ত না গৃহীত হত, তবে তোমরা যা গ্রহণ করেছিলে তার কারণে তোমাদের ওপর মহাশাস্তি নিপতিত হত। (৬৯) সুতরাং (এখন) তোমরা যে গনীমতের সম্পদ অর্জন করেছ তা বৈধ ও পবিত্র হিসেবে ভোগ কর এবং আল্লাহর (শাস্তি) থেকে নিজেদের রক্ষা কর; নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, অনন্ত করুণাময়।– সূরা আনফাল : ৬৭-৬৯

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত উমর গিয়ে দেখেন রাসূলুল্লাহ (সা.) কাঁদছেন। তিনি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে মহানবী বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা শাস্তির ভয় দেখিয়ে আয়াত নাযিল করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, যদি সত্যিই শাস্তি নাযিল হতো তাহলে মহানবী (সা.)-ও ধ্বংস হয়ে যেতেন।

এখন এ আয়াত নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

আমাদের উদ্দিষ্ট আয়াতের স্পষ্ট ব্যাখ্যার জন্য বদরের যুদ্ধ সম্পর্কিত অপর একটি আয়াত নিয়ে আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন। মহান আল্লাহ বলছেন :

كَمَآ أَخۡرَجَكَ رَبُّكَ مِنۢ بَيۡتِكَ بِٱلۡحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقٗا مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ لَكَٰرِهُونَ ٥ يُجَٰدِلُونَكَ فِي ٱلۡحَقِّ بَعۡدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلۡمَوۡتِ وَهُمۡ يَنظُرُونَ ٦ وَإِذۡ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحۡدَى ٱلطَّآئِفَتَيۡنِ أَنَّهَا لَكُمۡ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيۡرَ ذَاتِ

ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَـٰتِهِۦ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ۝٧ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَـٰطِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ۝٨

(৫) যেভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে তোমার গৃহ হতে ন্যায়সঙ্গতভাবে বের করেছিলেন, অথচ বিশ্বাসীদের একদল তা পছন্দ করে নি। (৬) তারা তোমার সাথে সত্যের ব্যাপারে বিতর্ক করে তা প্রকাশিত হওয়ার পরও, যেন তাদের মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং (আক্ষেপভরা নয়নে) তারা তা প্রত্যক্ষ করছে। (৭) এবং যখন আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দান করেছিলেন যে, দু'টি দলের মধ্যে একটি তোমাদের হোক, আর তোমরা চাইছিলে নিরস্ত্র দলটিই তোমাদের হোক এবং আল্লাহ নিজ বাণীর মাধ্যমে সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে এবং অবিশ্বাসীদের নির্মূল করতে চাইছিলেন। (৮) যাতে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে যায়, যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে।– সূরা আনফাল : ৫-৮

সূরা আনফালের ৭ নং আয়াতে আল্লাহ বদরের সাহাবীদের সম্পর্কে বলেছেন যে, তাঁরা নিরস্ত্র দলটির মুখোমুখি হতে চাচ্ছিলেন। কেন তাঁরা তা চাচ্ছিলেন? কারণ, সেটা ছিল বাণিজ্য কাফেলা। আর যুদ্ধের সময়ও ধন-সম্পদ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁদের মধ্যে বিরাজ করছিল বলেই তাঁরা যুদ্ধবন্দি করেছিলেন। তাঁদের আকাঙ্ক্ষাই ছিল মুক্তিপণ আদায় করা। তাদের এই মনোভাবের কারণেই আল্লাহ তা'আলা তিরস্কার করেছেন। কারণ, আয়াতের মধ্যে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে : 'তোমরা চাও পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ চাহেন পরলোকের কল্যাণ।' তাই বলা যায়, যারা সম্পদের লোভে এ কাজ করেছিল তাদেরকে উদ্দেশ্য করে এ আয়াত।

এ আয়াতের আরেকটি কারণ হলো যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই বন্দি করার বিষয়টি। সূরা আনফালের ৬৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

مَا كَانَ لِنَبِىٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِى ٱلْأَرْضِ

(৬৭) কোন নবীর পক্ষে যতক্ষণ না ভূমিতে (রণক্ষেত্রে) পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে (ততক্ষণ) বন্দি রাখা সমীচীন নয়।

এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধকালীন কোন বন্দি না রাখার ব্যাপারে এ আয়াতে আদেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যুদ্ধ শেষে বন্দি করতে হবে। আর কিছুসংখ্যক কাফিরকে হত্যা করাই উচিত ছিল।

আর শাস্তি বা আযাব প্রসঙ্গে বলা যায়, হযরত উমর ছাড়া নবীসহ সবাই ধ্বংস হয়ে যেত– এ কথাটি যে বানোয়াট তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কারণ, প্রথমত আয়াতের মধ্যে যে বলা হয়েছে : 'তোমরা চাও পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ চাহেন পরলোকের কল্যাণ'– এই কথা কি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য? রাসূল (সা.) কি পার্থিব জীবন কামনা করেছিলেন? নাউযুবিল্লাহ। দ্বিতীয়ত হযরত উমর রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে তাঁর ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন : 'তোমাদের সাথিরা যে মুক্তিপণ গ্রহণ করেছে তজ্জন্য শাস্তির আয়াত নাযিল হয়েছে। এজন্য কাঁদছি।'– সীরাতুন্নবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৭, বাংলাদেশ তাজ কোম্পানি। আরেকটি বর্ণনায় বলা হয়েছে : 'তোমার সঙ্গীদের ওপর যা পেশ করা হয়েছে, সে কারণে কাঁদছি।'– আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ২৫৩, আল কোরআন একাডেমী, লন্ডন সূত্রে তারীখে উমর ইবনে খাত্তাব, ইবনে জাওযী।

ভ্রু কুঞ্চিত করা সম্পর্কিত আয়াত

সূরা আবাসার ১ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ ﴿١﴾ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ﴿٢﴾ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ ﴿٣﴾ أَوْ
يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰٓ ﴿٤﴾ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ ﴿٥﴾ فَأَنتَ لَهُۥ تَصَدَّىٰ ﴿٦﴾ وَمَا
عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ ﴿٨﴾ وَهُوَ يَخْشَىٰ ﴿٩﴾ فَأَنتَ عَنْهُ
تَلَهَّىٰ ﴿١٠﴾ كَلَّآ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ ﴿١٢﴾

(১) সে ভ্রূকুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল, (২) কেননা, তার নিকট এক অন্ধ এল। (৩) তোমাকে কী অবহিত করবে যে, হয়তো সে পরিশুদ্ধ হবে, (৪) অথবা উপদেশ গ্রহণ করবে, ফলে উপদেশ তার কাজে আসবে। (৫) কিন্তু যে (বিত্তের

অহংকারে) নিজেকে অমুখাপেক্ষী জ্ঞান করে, (৬) তুমি তার প্রতি মনোযোগী হও; (৭) অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোন অপরাধ নেই; (৮) কিন্তু যে তোমার নিকট সোৎসাহে এল (৯) এবং সে সশংকচিত্ত, (১০) তুমি তাকে অবজ্ঞা কর; (১১) না, কখনই (তোমার পন্থা) এমন নয়, নিশ্চয় এ (কুরআন) এক উপদেশ (স্মারক); (১২) যে ইচ্ছা করবে সে উপদেশ গ্রহণ (ও স্মরণ) করবে।

কোন কোন তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) একদল কাফিরের সাথে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। এসময় অন্ধ সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন এবং একটি বিষয়ে প্রশ্ন করেন সাথে সাথে জবাব দেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। এই পীড়াপীড়ি করা রাসূলের কাছে বিরক্তিকর ঠেকে।–তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, পৃ. ১৪৩৬ (ইবনে কাসীরের এক রেওয়ায়েতে)

আসলেই কি আমাদের নবী একজন অন্ধ সাহাবির প্রতি এমন আচরণ করেছিলেন? আসুন আয়াতের টেক্সট এর দিকে লক্ষ্য করি। প্রথম আয়াতে দুটি শব্দে দুটি লুক্কায়িত সর্বনাম 'সে' ব্যবহৃত হয়েছে– 'সে' ভ্রু কুঞ্চিত করল এবং 'সে' মুখ ফিরিয়ে নিল। দ্বিতীয় আয়াতে 'তার' (হু) সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে। এরপর তৃতীয় আয়াত থেকে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে।

যদি প্রথম দুটি সর্বনাম দ্বারা রাসূলকে বুঝানোই উদ্দেশ্য হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী আয়াতগুলোর মতো সরাসরি এভাবে বলতে পারতেন– 'তুমি ভ্রু কুঞ্চিত করলে ও মুখ ফিরিয়ে নিলে। কারণ, তোমার নিকট অন্ধ লোকটি আসল।' কিন্তু আল্লাহ তা করেন নি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এখানে কোন্ ব্যক্তি ভ্রু কুঞ্চিত করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল তা উহ্য রেখেছেন।

কোন কোন তাফসীরকার যে ব্যাখ্যা করেছেন এ কাজটি রাসূলুল্লাহ করেছেন তাঁরা এই ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করা বা নামপুরুষ 'সে' ব্যবহার করার কারণ হিসেবে বলেছেন যে, মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁর নাম উল্লেখ করেন নি বা সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করেন নি, তাঁরা পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতের প্রতি দৃষ্টি না দিয়েই এমন মন্তব্য করেছেন। আর তাঁরা প্রকৃত শানে নুযূল সম্পর্কেও অমনোযোগী থেকেছেন।

আল্লামা জাওয়াদী বলেন : 'আয়াতটি সে সময় নাযিল হয়েছিল যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট মূর্তিপূজক কুরাইশরা এসেছিল এবং তিনি তাদের ইসলামের প্রতি আহ্বান করছিলেন। এমন সময় সেখানে হযরত খাদীজার সম্পর্কীয় ভাই ও অন্ধ সাহাবি ইবনে উম্মে মাকতুম উপস্থিত হন। তিনি মহানবীর নিকট ইসলামি প্রশিক্ষণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে থাকেন। কিন্তু কোন কোন লোক তাঁর আগমনে বিরক্তি প্রকাশ করে। আল্লাহ উভয়ের সম্পর্কে স্পষ্ট করে দেন যে, সেই ব্যক্তির বিরক্ত হওয়ার অধিকার ছিল না। আগন্তুক আল্লাহর এক মুমিন বান্দা, অথচ রাসূলের নিকট উপস্থিত ব্যক্তিরা ছিল কাফির। তাই তাঁর (রাসূলের) পক্ষে মুমিনকে ছেড়ে কাফিরদের নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কারণ, রাসূলের দায়িত্ব কেবল ঐশী বাণী পৌঁছে দেয়া। কোন কোন তাফসীরকারক মহানবী (সা.)-কে ভ্রূকুঞ্চনকারী বলে অভিযোগ করেছেন। অথচ সেই ব্যক্তি তিনি নন; বরং অন্য কেউ। যেমন কিছু সংখ্যক রেওয়ায়েতে হযরত উসমানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে বনী উমাইয়্যার এক ব্যক্তি বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে মহানবী আদৌ যুক্ত নন। হয়ত বনী উমাইয়্যা নিজেদের দোষ ঢাকার জন্য আয়াতের শানে নুযূল মহানবীর ওপর আরোপ করেছে।'

এখন এই আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যার জন্য আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের অন্যান্য আয়াতও এ আয়াতের পাশে নিয়ে আসতে হবে।

মহান আল্লাহ মহানবী (সা.)-এর নবুওয়াতের শুরুতেই তাঁর ওপর অবতীর্ণ অন্যতম সূরায় (সূরা কালাম : ৪) তাঁর শ্রেষ্ঠ চরিত্রের স্বীকৃতি এভাবে দিয়েছেন– وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيْمٍ 'নিঃসন্দেহে তুমি অতীব মহান চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছ।' অর্থাৎ যখন তিনি প্রাথমিকভাবে তাঁর দাওয়াতী কর্মকাণ্ড শুরু করেছেন তখনই আল্লাহ মানবজাতির সামনে তাঁর রাসূলের এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় তুলে ধরে এ নিশ্চয়তা দান করেছেন যে, তাঁর থেকে এর পরিপন্থী আচরণ কখনই হবে না।

আবার সূরা আহযাবের ২১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

'নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে (অনুসরণীয়) উত্তম আদর্শ রয়েছে...।'

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মুমিনদের প্রতি তাঁর ভালবাসার তীব্রতাকে আল্লাহ তা'আলা এভাবে তুলে ধরেছেন–

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

'তোমাদের দুর্ভোগ তার পক্ষে দুর্বিষহ। সে তোমাদের (কল্যাণের) অভিলাষী, বিশ্বাসীদের প্রতি অতিশয় দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।' (সূরা তওবা : ১২৮)

মহান আল্লাহর দুটি গুণবাচক বৈশিষ্ট্য– 'অতিশয় দয়ার্দ্র' ও 'পরম দয়ালু' এখানে রাসূলের সাথে সংযোগ করা হয়েছে। অন্যদিকে হারিছ حريص অর্থ লোভী। অর্থাৎ মুমিনদের জন্য তিনি ভীষণভাবে লালায়িত। তাই এমন রাসূল কখনই কোন মুমিনের প্রতি ভ্রুকুঞ্চিত করতে পারেন না এবং তাকে ত্যাগ করে কোন অহংকারমত্ত মুশরিকের প্রতি মনোযোগী হতে পারেন না।

অন্যদিকে মহানবীর প্রতি আদেশ এসেছে :

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾

এবং তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর। (২১৫) এবং বিশ্বাসিগণের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে তাদের জন্য স্বীয় স্কন্ধ নত করে দাও (সদয় হও)।– সূরা শুয়ারা : ২১৪-২১৫

রাসূলুল্লাহ (সা.) কি এ আয়াত নাযিলের পরও মুমিনদের প্রতি সদয় না হয়ে কাফিরদের প্রতি মনোযোগী হবেন?

আর যে ব্যক্তি ভ্রুকুঞ্চিত করেছে মহান আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে সম্বোধনের উপযুক্ত মনে করেন নি। তাই মহানবীকে সম্বোধন করে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কাজের নিকৃষ্টতাকে প্রকাশ করেছেন। এ ধরনের উক্তির জন্য আরবি ভাষায় 'তোমাকে বলছি, কিন্তু হে প্রতিবেশী তুমি শোন' প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়। পবিত্র কুরআনে এ ধরনের অসংখ্য নমুনা রয়েছে।

যেমন রাসূল (সা.)-এর কোন দিন শির্ক করার সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও সূরা যুমারের ৬৫ নং আয়াতে শির্ক করলে তাঁর আমল বিনষ্ট হওয়ার কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তাঁকে নয় বরং তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেছেন–

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٦٥﴾

নিঃসন্দেহে তোমার নিকট এবং তোমার পূর্বসূরিদের নিকট এ প্রত্যাদেশ করা হয়েছিল, 'যদি তুমি (আল্লাহর সাথে) অংশী কর, তবে অবশ্যই তোমার সমুদয় কৃতকর্ম বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

তেমনি সূরা ইউনূসের ৯৪ নং আয়াতে রাসূল (সা.)-কে কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে আহলে কিতাবকে জিজ্ঞেস করতে বলা হয়েছে–

فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْـَٔلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾

আমরা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি যদি তুমি তাতে সন্দিগ্ধমনা হও, তবে যারা তোমার পূর্ব থেকে গ্রন্থ পাঠ করছে তাদের জিজ্ঞেস কর। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে সত্য (গ্রন্থ) এসেছে। সুতরাং তুমি কখনই সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

সূরা হূদ এর ১৭ নং আয়াতেও একইভাবে সন্দেহ না করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে :

أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِۦ كِتَٰبُ مُوسَىٰٓ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ

যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর (আল্লাহর) পক্ষ হতে একজন সাক্ষী তার অনুসরণ করে এবং তার পূর্বে মূসার গ্রন্থ (যা) পথ প্রদর্শক (ইমাম) ও অনুগ্রহস্বরূপ (তার সত্যতার প্রমাণ) ছিল, (সে কি মিথ্যা আরোপকারী হতে পারে?)। (যারা সত্যাকাঙ্ক্ষী অবশ্যই) তারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং (বিভিন্ন) দলগুলো থেকে যে কেউ তাকে অস্বীকার করবে তার প্রতিশ্রুত স্থান হল জাহান্নাম। সুতরাং তুমি এ বিষয়ে সন্দিগ্ধমনা হয়ো না। কেননা, এটা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস স্থাপন করে না।

রাসূলের ক্ষেত্রে সন্দেহের বিষয়টি অবান্তর। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হলো মুশরিকরা যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন মানুষের নবুওয়াত লাভের বিষয়টি অস্বীকার করত।

সূরা হাক্কাহর ৪৪-৪৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿٤٦﴾

(৪৪) সে যদি আমার নামে কোন কথা উদ্ভাবন করত, (৪৫) তবে অবশ্যই আমরা তার ডান হাত ধরতাম, (৪৬) অতঃপর অবশ্যই তার কণ্ঠ-শিরা কেটে দিতাম।

রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনই মহান আল্লাহর নামে মিথ্যা উদ্ভাবন করতে পারেন না। অথচ তাঁর সম্পর্কে এ আয়াত নাযিলের মাধ্যমে বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

সূরা বনি ইসরাইলের ২৩-২৪ নং আয়াতে আল্লাহ রাসূলকে পিতা-মাতার সাথে আচরণের বিষয়টি সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ রাসূলের পিতা-মাতা তখন জীবিত ছিলেন না।

۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا

كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

(২৩) তোমার প্রতিপালক নিশ্চিত বিধান প্রদান করেছেন যে, তাঁকে ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচার করবে; যদি তাঁদের মধ্যে একজন বা উভয়েই তোমার সম্মুখে বার্ধক্যে উপনীত হন, তবে তাঁদেরকে 'উফ্' (ন্যূনতম অসম্মানজনক কথা) পর্যন্ত বলবে না, আর তাদের ধমক দিয়ে (ও ভর্ৎসনা করে) তাড়িয়ে দিও না এবং তাদের সাথে সম্মানসূচক (মমতাপূর্ণ) কথা বলবে। (২৪) এবং তাঁদের সম্মুখে বিনয়-নম্র হয়ে নিজের কাঁধ নত করে দেবে এবং বলবে (তাঁদের জন্য প্রার্থনা করতে থাকবে), 'হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের উভয়ের প্রতি করুণা কর, যেরূপে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।'

উপরিউক্ত আয়াতগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মহান আল্লাহ মহানবীকে সম্বোধন করে কথা বলে ভ্রুকুঞ্চনের বিষয়টির গুরুতর হওয়াকেই তুলে ধরেছেন।

অন্যদিকে আমরা লক্ষ্য করি পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা ভ্রুকুঞ্চন করার বিষয়টিকে একজন মুশরিকের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। সূরা মুদ্দাসসিরের ২২-২৩ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে :

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ وَٱسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾

(২২) অতঃপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল। (২৩) অতঃপর সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল এবং অহংকার করল।

এ আয়াতটি মুশরিক ওলীদ ইবনে মুগীরা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।– আল কুরআনুল কারীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ৯৬৭, টীকা-১৭৬৮

তাই কিভাবে এটি সম্ভব যে, মহান ও সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি একজন মুশরিকের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করবেন?

সবশেষে আরবি ব্যাকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বিষয় উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে। সূরা আবাসার ১১ নং আয়াতে বলা হয়েছে : كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ 'না, কখনই

(তোমার পন্থা) এমন নয়'– এ আয়াতটি সুস্পষ্টভাবে পূর্ববর্তী আচরণ যে রাসূল (সা.)-এর দ্বারা সংঘটিত হয় নি তা প্রমাণ করে। আরবি ব্যাকরণে كَلَّا ব্যবহার করার ক্ষেত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে তা পূর্ববর্তী বিষয়গুলোকে অস্বীকার করে।

রাসূলের আগের পরের সমস্ত গুনাহ মাফ সংক্রান্ত আয়াত

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾ لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ
وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٢﴾ وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا

(১) নিশ্চয় আমরা তোমাকে বিজয়দান করেছি, প্রকাশ্য এক বিজয়। (২) যাতে আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করে দেন [অগ্র-পশ্চাতের সমস্ত কর্মের মন্দ প্রভাবকে আবৃত (অপসৃত) করেন] এবং তোমার প্রতি তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরলপথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

এ আয়াতে কখনই 'যাম্ব' শব্দটি তার পারিভাষিক (গুনাহ) অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কারণ, আল্লাহ কোন ব্যক্তিকেই শর্তহীনভাবে ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গুনাহের অনুমতি দিতে পারেন না। বরং এ আয়াতে 'যাম্ব' শব্দটি আভিধানিক অর্থে এসেছে। অর্থাৎ কোন কর্মের মন্দ প্রভাব বা ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া বা পরিণতি অর্থে এসেছে। তেমনি আয়াতে 'গাফারা' শব্দটিও ঢেকে রাখা ও আবৃত করা অর্থে এসেছে যা এর আভিধানিক অর্থ। মুশরিকরা তাদের মূর্তিদের সমালোচনা ও তাদের অনুসৃত ধর্মের প্রতি বিদ্বেষের কারণে মহানবী (সা.)-কে অপরাধী মনে করত। তাছাড়া তাঁর সাথে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধে কুরাইশদের বড় বড় বীর নিহত হয়েছিল। এ কারণেও তারা তাঁর বিরুদ্ধে স্বীয় জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনত। এ সকল বিষয় রাসূল (সা.)-এর দাওয়াতী কার্যক্রমের ফলে স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছিল। প্রয়োজন ছিল নবী (সা.)-এর নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের ধারায় সৃষ্ট এ বিরূপ প্রতিক্রিয়াকে মহান আল্লাহ বিনষ্ট করে ইসলামের পথকে মসৃণ করবেন। এ কাজটিই হুদায়বিয়ার সন্ধি ও তার পরিণতিতে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে সম্পাদিত হওয়ার উল্লেখ আল্লাহ এ আয়াতে করেছেন। এ কারণেই আয়াতটিতে প্রকাশ্য বিজয়ের দ্বারা সকল অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ অপসৃত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ রাসূল (সা.)-এর অগ্র-

পশ্চাতের সমস্ত মন্দ প্রভাব অপসারণকে আল্লাহ বিজয় দানের উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করেছেন।

অনেকে বলেছেন ذنب শব্দটা এখানে কষ্ট বা যাতনা অর্থে এসেছে এবং ك অর্থাৎ তোমার হলো কর্ম। ذنبك অর্থ তোমার ওপর যে যাতনা নিপতিত হয়েছিল।

অনেকে বলেছেন, কাফিরদের ব্যঙ্গ করে এখানে আল্লাহ রাসূলের গুনাহের কথা বলেছেন। কাফিরদের দৃষ্টিতে তাদের মূর্তিদের বিরোধীতা করা গুনাহ। আল্লাহ এখানে রাসূলের সেই গুনাহের পুরস্কার দিয়েছেন সুস্পষ্ট বিজয়ের মাধ্যমে।

তাবুকের যুদ্ধে না যেতে অনুমতি দেয়া প্রসঙ্গে অবতীর্ণ আয়াত

عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَتَعْلَمَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٤٣﴾

'(হে রাসূল!) আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন! তুমি কেন তাদের (মুনাফিকদের) পশ্চাতে থেকে যাওয়ার অনুমতি দিলে? অন্যথায় তোমার সম্মুখে সত্যভাষীরা স্পষ্ট হয়ে যেত এবং তুমি মিথ্যাবাদীদেরও জেনে নিতে।'–সূরা তওবা : ৪৩

এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল তাবুক যুদ্ধের ব্যাপারে। মহানবী (সা.) সাহাবিদেরকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বললে অনেকে বিভিন্ন অজুহাতে যুদ্ধ গমন হতে বিরত থাকার অনুমতি প্রার্থনা করেন। মহানবী (সা.) তাঁদেরকে অনুমতি দেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলো নাযিল করেন। এ আয়াতের ক্ষেত্রে কেউ কেউ বলে থাকেন যে, আল্লাহ তা'আলা মহানবী (সা.)-কে এমন অনুমতি দানের জন্য তিরস্কার করেছেন। অথচ তিরস্কারের বিষয়টি কখনই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর পতিত হয় না যা পরবর্তী আয়াতগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলেই স্পষ্ট হয়ে যায়। পরের আয়াতগুলোতে আল্লাহ নিজেই বলেছেন যে, তিনিই যারা যুদ্ধে যেতে চান নি তাঁদেরকে বসিয়ে রেখেছেন। আয়াতে এরশাদ হচ্ছে :

۞ وَلَوۡ أَرَادُواْ ٱلۡخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُۥ عُدَّةٗ وَلَٰكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنۢبِعَاثَهُمۡ فَثَبَّطَهُمۡ وَقِيلَ ٱقۡعُدُواْ مَعَ ٱلۡقَٰعِدِينَ ﴿٤٦﴾ لَوۡ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمۡ إِلَّا خَبَالٗا وَلَأَوۡضَعُواْ خِلَٰلَكُمۡ يَبۡغُونَكُمُ ٱلۡفِتۡنَةَ وَفِيكُمۡ سَمَّٰعُونَ لَهُمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤٧﴾

(৪৬) তারা যদি (জিহাদের উদ্দেশ্যে) বের হওয়ার সংকল্প করত, তবে তার জন্য উপকরণ সংগ্রহ করত। কিন্তু আল্লাহ তাদের বের হওয়ার প্রেরণাকেই অপছন্দ করেছেন, ফলে তাদের ফিরিয়ে রাখলেন; এবং (যেন তাদের) বলা হল, 'তোমরা উপবেশনকারীদের সাথে বসে থাক।' (৪৭) যদি তারা তোমাদের সাথে বেরও হত, তবে তোমাদের দ্বিধা ও অস্থিরতাই শুধু বৃদ্ধি করত এবং তোমাদের মধ্যে বিপর্যয় (ও বিভেদ) সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ছুটাছুটি করত। আর তোমাদের মধ্যে তাদের গুপ্তচরও রয়েছে। এবং আল্লাহ অবিচারকদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন যে, ঐসব ব্যক্তি অন্যান্য মুসলমানের সাথে এ যুদ্ধে গমন করলে বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করত। আর মহানবী (সা.) যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেটাকেই তিনি যথার্থ বলেছেন। আর প্রথম আয়াতের শুরুতেই রাসূলকে যে ক্ষমা করার কথা বলা হয়েছে তা ভুল-ত্রুটিকে ক্ষমা করা অর্থে নয়; বরং এহসান বা দয়া অর্থে এসেছে।

পবিত্র কোরআন ও হাদিসের দৃষ্টিতে শাফায়াত

ভূমিকা

সকল ধর্মবিশ্বাসী, বিশেষত সাধারণভাবে সকল মুসলমানই শাফায়াতে বিশ্বাসী অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র ওলিগণ একদল গুনাহগার বান্দার জন্য সুপারিশ ও ক্ষমা প্রার্থনা (শাফায়াত) করবেন এবং এর মাধ্যমে তাদেরকে দোযখের আগুন হতে মুক্তি দিবেন। আবার কারো কারো মতে শাফায়াতের অর্থ আল্লাহ্‌র ওলিগণ সুপারিশের মাধ্যমে ব্যক্তির মর্যাদা ও অবস্থানের উত্তরণ ঘটাবেন। কিন্তু এই সুপারিশের বৈশিষ্ট্য ও পরিমাণ নিয়ে ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যেমন ইহুদীরা তাদের ওলী ও নবীদের ক্ষেত্রে শর্তহীন সুপারিশের অধিকারে বিশ্বাসী। কোরআন এ বিশ্বাসকে সুস্পষ্টভাবে ভিত্তিহীন বলে ঘোষণা করেছে। মুসলমানদের মধ্যে একদল লোক বিশ্বাস করে শুধু আল্লাহ্‌র নিকট শাফায়াত কামনা করা জায়েয, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট শাফায়াত কামনা করা শির্‌ক বলে গণ্য। কিন্তু সাধারণভাবে মুসলমানরা বিশ্বাস করেন শাফায়াতের (আল্লাহ্‌র নিকট সুপারিশ ও ক্ষমা প্রার্থনা) অধিকার আল্লাহ্‌ তাঁর কোন কোন বিশেষ বান্দাকে দিয়েছেন এবং মুসলমানরা সরাসরি তাঁদের নিকট শাফায়াতের আবেদন করতে পারে। তবে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সুপারিশ গ্রহণের ও ক্ষমা করার অধিকার প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র এবং তাঁর ওলিগণ তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে এই শাফায়াত করবেন অর্থাৎ এক্ষেত্রে তাঁরা স্বাধীন নন; বরং আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অনুবর্তী। আমরা এখানে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।

কোরআনের শাফায়াত সম্পর্কিত আয়াতসমূহকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়।

১. যে সকল আয়াত শাফায়াতকে প্রত্যাখ্যান করে :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَـٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَـٰعَةٌ ۗ وَٱلْكَـٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে যে জীবিকা দেয়া হয়েছে তা হতে ব্যয় কর সেদিন আসার পূর্বে যেদিন কোন ক্রয় বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও শাফায়াত নেই এবং কাফেররা বুঝতে পারবে তারাই জুলুমকারী ছিল।" (সূরা বাকারা : ২৫৪)

কিন্তু অন্যত্র কোরআনে আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে শাফায়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং উক্ত আয়াতটিতে যে শাফায়াত আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত সংঘটিত হবে তাকেই অস্বীকার করা হয়েছে।

২. ইহুদীদের বিশ্বাসের শাফায়াতকে বাতিল ঘোষণা :

يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٤٧﴾ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَـٰعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾

"হে বনি ইসরাঈল (ইসরাঈলের সন্তানগণ)! তোমাদের উপর যে নিয়ামত দিয়েছি তা স্মরণ কর। এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে বিশ্ববাসীদের উপর প্রাধান্য দিয়েছিলাম। সেদিনকে ভয় কর (সেদিন হতে নিজেকে রক্ষা কর) যেদিন একজনকে অপরের জন্য শাস্তি দেয়া হবে না এবং কারো শাফায়াত (সুপারিশ) গ্রহণ করা হবে না। কোন বিনিময় গৃহীত হবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্তও হবে না।"[১]

এ আয়াতে কোরআন বিশেষ ধরনের শাফায়াতকে বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে অর্থাৎ ইহুদীরা যে শর্তহীন শাফায়াতে বিশ্বাসী ছিল তা এ আয়াতে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কারণ এ ধরনের শাফায়াতের ক্ষেত্রে অনুমতির প্রয়োজন নেই ধারণা করা

১. সূরা বাকারা : ৪৭-৪৮।

হয়েছে এবং শাফায়াতকারী ও যার জন্য শাফায়াত করা হবে উভয়ের জন্যই কোন শর্ত আরোপ করা হয় নি।

৩. কাফেরদের জন্য শাফায়াতকে প্রত্যাখ্যান :

وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّىٰٓ أَتَىٰنَا ٱلْيَقِينُ ﴿٤٧﴾

"(কাফেররা বলবে) আমরা প্রতিদান দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম। এমতাবস্থায় মৃত্যু আমাদের সামনে উপস্থিত হল (এবং আমরা কিয়ামতের বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করলাম)। আর সেদিন শাফায়াতকারীদের শাফায়াত তাদের কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না।"[১]

৪. মূর্তিদের শাফায়াতের অধিকার প্রত্যাখ্যান :

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّـُٔونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾

"তারা (মুশরিকরা) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা করে যা তাদের কোন অকল্যাণ ও কল্যাণই করতে পারে না। তারা বলে এই মূর্তিগুলো আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট শাফায়াতকারী, তাদেরকে বল, তোমরা কি আল্লাহ্‌কে এমন এমন বিষয়ে জানাতে চাও আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যে বিষয়ে তিনি অবহিত নন। তোমরা যাকে তাঁর শরীক কর তিনি তা হতে পবিত্র ও ঊর্ধ্বে।"[২]

৫. শাফায়াত কেবল আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট :

قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَٰعَةُ جَمِيعًا ۖ لَّهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾

১. সূরা আল মুদাস্‌সির : ৪৬-৪৮।
২. সূরা ইউনুস : ১৮।

"শাফায়াত আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট। তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অধিপতি। অতঃপর তোমরা তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে।"[১]

৬. শাফায়াত আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যদের জন্য শর্তাধীন :

مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ إِذۡنِهِۦۚ

"তাঁর অনুমতি ব্যতীত কোন শাফায়াতকারী নেই।"[২]

وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنۡ أَذِنَ لَهُۥۚ

"কারো জন্য তার নিকট শাফায়াত তাঁর নিকট ফলপ্রসূ হবে না সেই ব্যক্তির জন্য ব্যতীত যাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে।"[৩]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহকে সমন্বিত করে নিম্নোক্ত ফল পাওয়া যায় : যেহেতু কর্মের ক্ষেত্রে আল্লাহর কর্মগত একত্ববাদের নীতির (তাওহীদে আফআলী) ভিত্তিতে বিশ্বে সকল কর্মের প্রকৃত প্রভাবক ও কর্তা হলেন আল্লাহ এবং কোন কর্মই তাঁর ইচ্ছা ও অনুমতি ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না সেহেতু কোন কোন আয়াতে শাফায়াতকে নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়টির সঙ্গে যে সকল আয়াতে তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে অন্যদের শাফায়াতের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ তিনিই তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে বিশেষ শর্তাধীনে অন্যদের তা করার অধিকার দিয়েছেন যেমন নবী ও তাঁর ওলীদের এমনটি দিয়েছেন।

পবিত্র কোরআনে শাফায়াত

কয়েকটি কারণে মানব জাতির জন্য শাফায়াতের অপরিহার্যতা দেখা দেয়।

১. মানব জাতির গুনাহে পতিত হওয়া : কেউ কেউ বলেন, 'কিয়ামত দিবসে মানুষের একমাত্র মুক্তির উপকরণ হলো সৎকর্ম।' যেমন পবিত্র কোরআনে এসেছে :

১. সূরা যুমার : ৪৪।
২. সূরা ইউনুস : ৩।
৩. সূরা সাবা : ২৩।

وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَهُۥ جَزَآءً ٱلْحُسْنَىٰ

"এবং যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তার জন্য উত্তম প্রতিদান রয়েছে।"[১]

রয়েছে।"[১]

যদিও সাফল্য, সৌভাগ্য ও প্রতিদান লাভের বিষয়টি সৎকর্মের উপর অনেকটাই নির্ভর করে, কিন্তু অন্যান্য আয়াত হতে বোঝা যায়, শুধু সৎকর্মের মাধ্যমে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয় যদি না মহান আল্লাহ্‌র অপরিসীম রহমত তার সঙ্গে যুক্ত না হয়। যেমন,

فَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٦٤﴾

"যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহমত তোমাদের উপর না থাকত, তবে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে।"[২]

وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ

"যদি আল্লাহ্‌ মানব জাতিকে তাদের অন্যায়ের জন্য ধরতেন তবে পৃথিবীর উপর বিচরণশীল কোন প্রাণীকেই ছাড়তেন না।"[৩]

وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا۟ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ

"যদি আল্লাহ্‌ মানুষকে তার কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতেন তবে ভূপৃষ্ঠের উপর চলমান কাউকে ছেড়ে দিতেন না।"[৪]

২. আল্লাহ্‌র রহমতের ব্যাপকতা :

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا

১. সূরা কাহ্‌ফ : ৮৮।
২. সূরা বাকারা : ৬৪।
৩. সূরা নাহল : ৬১।
৪. সূরা ফাতির : ৪৫।

অর্থাৎ "হে আমাদের পালনকর্তা! আপনার রহমত ও জ্ঞান সকল কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে।"[১]

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ

"যদি তারা তোমার প্রতিপালককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে বল তোমাদের প্রভু অসীম রহমতের অধিকারী।"[২]

শাফায়াত আল্লাহ্‌র ওলীদের রহমতের অন্যতম দৃষ্টান্ত।

৩. মানুষের অন্যতম মৌল আকাঙ্ক্ষা হলো মুক্তি। বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি ও অভিজ্ঞতার আলোকে এটি প্রমাণিত যে, মানুষের অন্যতম মৌল আকাঙ্ক্ষা হলো পৃথিবী ও আখেরাতের শাস্তি হতে মুক্তি লাভ। যেহেতু মানুষের অন্যতম অভ্যন্তরীণ মৌল দিক এটি, সেহেতু মৃত্যুর পর বারজাখ (কবরের জীবন) হতে শুরু করে কিয়ামতের দিবস ও জাহান্নামে (সীমিত সময়ের জন্য) শাস্তি দানের মাধ্যমে তাকে পবিত্র করে তার সত্তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যই শাফায়াত।

শাফায়াতের প্রভাব

শাফায়াতের প্রভাব ও ফলাফল সম্পর্কে দু'টি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে (১) শাফায়াত গুনাহকে মুছে দেয় ও শাস্তিকে লাঘব করে; (২) শাফায়াতের মাধ্যমে পুণ্য বৃদ্ধি পায় ও মর্যাদার উত্তরণ ঘটে। অধিকাংশ মুসলমান প্রথম অর্থে শাফায়াত গ্রহণ করেন। কিন্তু মুতাজিলাগণ দ্বিতীয় অর্থকে স্বীকার করে ও প্রথম অর্থকে গ্রহণযোগ্য মনে করে না। আমাদের মতে প্রথম অর্থ অধিকতর উপযুক্ত। এ যুক্তিতে :

১. শাফায়াতের বিষয়টি ইসলাম পূর্ব ইহুদী ও মুশরিকদের বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইসলাম শাফায়াতের বিষয়ে তাদের মধ্যে প্রচলিত কসংস্কার মূলক বিশ্বাসসমূহকে পরিশুদ্ধ করে সঠিক ধারণাটি ইসলামী সমাজে উপস্থাপন করেন। ইসলাম পূর্ব ইহুদী ও মুশরিকদের শাফায়াত সম্পর্কিত বিশ্বাসের বিষয়ে যাদের ধারণা রয়েছে তারা জানেন যে, তারা যে ধরনের শাফায়াতে বিশ্বাসী ছিল এবং তাদের

১. সূরা মুমিন : ৭।
২. সূরা আনআম : ১৪৭।

নবীদের ও পূর্ব পুরুষদের অধিকার বলে জানত, তা তাদের গুনাহসমূহের ক্ষমার জন্যই ছিল। কিন্তু তাদের এ বিশ্বাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্যা ছিল তা হলো তারা শাফায়াতের অধিকারকে শর্তহীন মনে করত। তাই ইসলাম শাফায়াতের প্রতি বিশ্বাসকে আল্লাহ্‌র অনুমতির শর্তাধীন বলে ঘোষণা করে বলে:

مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ

"কে আছে এমন যে সুপারিশ (শাফায়াত) করবে তাঁর নিকট তাঁর অনুমতি ছাড়া"[১] এবং ولا يشفعون إلا لمن ارتضى "যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট তার জন্য ব্যতীত অন্য কারো জন্য শাফায়াতকারীরা শাফায়াত করতে পারে না।" (সূরা আম্বিয়া : ২৮)

২. শিয়া ও সুন্নী উভয়সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহ শাফায়াতের সর্বজনীনতার প্রতিই ইঙ্গিত করে, যেমন মহানবী (সা.) বলেছেন :

اذّخرتُ شفاعتى لأهل الكبائر من امّتى

'আমার সুপারিশকে আমার উম্মতের কবীরা গুনাহকারীদের জন্য সঞ্চিত রেখেছি।'[২]

৩. কোন কোন আয়াতের ইশারা হতে বোঝা যায় আল্লাহ্ কোন কোন ক্ষেত্রে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা ব্যতীতই গুনাহকে ক্ষমা করেন। এই সকল আয়াত গুনাহ মোচনের সাথেই অধিক সংগতিশীল। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন :

وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ

"তিনি আল্লাহ্ বান্দাদের তওবাকে গ্রহণ করেন ও গুনাহসমূহকে ক্ষমা করেন।"[৩]

শাফায়াতকারীদের হতে শাফায়াতের আবেদন

১. সূরা বাকারা : ২৫৫।
২. সুনানে ইবনে মাজা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৪১।
৩. সূরা শুরা : ২৫।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি অনেক গুনাহকারীকে আল্লাহ্ শাফায়াতের মাধ্যমে ক্ষমা করেন। পবিত্র কোরআন শাফায়াতের বিষয়টি নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিয়ে তা আল্লাহ্র অনুমতি সাপেক্ষে হবে বলে ঘোষণা করেছে।

مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ

"কে আছে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে।"[১]

অন্যত্র বলেছেন :

مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ إِذْنِهِۦ

"কোন সুপারিশকারীই তাঁর অনুমতির পূর্বে সুপারিশ করতে পারে না।"[২]

অন্যদিকে শাফায়াতের বিষয়ে মূর্তিপূজকদের বিশ্বাসকে এ কারণে বাতিল বলে ঘোষণা করেছে যে, তারা এমন বস্তুকে সুপারিশকারী বলে গ্রহণ করেছে যার কল্যাণ ও অকল্যাণের ক্ষমতা নেই ও আল্লাহ্র পক্ষ হতে সুপারিশের কোন অধিকারও নেই। তাই বলা হয়েছে :

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّـُٔونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾

"(এই অজ্ঞ ব্যক্তিরা) আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা করে যা তাদের কোন অকল্যাণ ও কল্যাণই করতে পারে না এবং তারা বলে এই মূর্তিগুলো আল্লাহ্র নিকট আমাদের জন্য সুপারিশকারী। বলুন, (হে নবী!) তোমরা কি আল্লাহ্কে এমন এমন বিষয়ে খবর দিতে চাও আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যে বিষয়ে তিনি অবহিত নন। তোমরা তাঁর সঙ্গে যাকে শরীক কর তিনি তা হতে পবিত্র ও ঊর্ধ্বে।"[৩]

---

১. সূরা বাকারা : ২৫৫।
২. সূরা ইউনুস : ৩।
৩. সূরা ইউনুস : ১৮।

সুতরাং যে আয়াতটি মুশরিকদের মূর্তিকে সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাকে শাফায়াতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকারের পক্ষে দলিল হিসাবে উপস্থাপন সুস্পষ্ট অপযুক্তি। কারণ ইসলামে সুপারিশকারীর উপাস্য হওয়া ও শর্তহীন সুপারিশের বিষয়গুলো আদৌ নেই। পবিত্র কোরআন ফেরেশতা মণ্ডলীকে সুপারিশকারী হিসেবে ঘোষণা করে বলেছে, তারা যার প্রতি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি রয়েছে তার জন্য ব্যতীত সুপারিশ করে না।

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾ لَا يَسْبِقُونَهُۥ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِۦ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ

"বরং তারা আল্লাহ্‌র সম্মানিত বান্দা, তারা কখনোই আল্লাহ্‌র নির্দেশের অগ্রগামী হয় না এবং তাঁর নির্দেশেই কাজ করে। তিনি (আল্লাহ্) তাদের অগ্র ও পশ্চাতে যা আছে সে সম্পর্কে অবহিত। তারা তাদের জন্যই শাফায়াত করে যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।"[১]

সুতরাং মহানবী (সা.) ও অন্যান্যদের জন্য কিয়ামতের দিন শাফায়াতের বিষয়টি স্বীকৃত অর্থাৎ তাঁদের সুপারিশের অধিকার রয়েছে তখন মুমিনদের জন্য তাঁদের নিকট সুপারিশ কামনা বৈধ ও জায়েয হবে, যেমন দোয়ার ক্ষেত্রেও রয়েছে।

শাফায়াতকারীদের নিকট শাফায়াতের বিষয়ে ওয়াহাবীদের মত

ওয়াহাবিগণ যদিও শাফায়াতের বিষয়টিকে অস্বীকার করেন না, কিন্তু শাফায়াতের বিধান ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তারা অন্যান্য মুসলমানদের শাফায়াত সম্পর্কিত বিশ্বাসকে শির্‌কমিশ্রিত মনে করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য তা হলো শাফায়াতকারীদের নিকট শাফায়াত কামনা করা সম্পর্কিত। মুসলমানদের সকল মাজহাবের নিকট শাফায়াতের অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে শাফায়াত কামনা তাঁর জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় জায়েয। কিন্তু ওয়াহাবীদের মতে এরূপ বিশ্বাস শির্‌কের শামিল। তারা

১. সূরা আম্বিয়া : ২৬-২৮।

বিশ্বাস করে শাফায়াত কামনার সঠিক পন্থা হলো বান্দা সরাসরি আল্লাহ্‌র নিকট চাইবে তাঁর রাসূল (সা.) অথবা শাফায়াতের অধিকারী বান্দা যেন তার জন্য সুপারিশ করে।

ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, 'যদি কেউ বলে যে, যেহেতু রাসূল (সা.) আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত সেহেতু আমি তাঁর নিকট চাই তিনি যেন এ বিষয়ে আল্লাহ্‌র নিকট সুপারিশ করেন', তবে তার কাজটি মুশরিকদের অনুরূপ বলে গণ্য হবে।'[১]

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব বলেছেন, 'একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট শাফায়াত চাইতে হবে, কোন শাফায়াতকারীর নিকট নয়। অর্থাৎ এভাবে বলতে হবে যে, হে আল্লাহ্! রাসূল (সা.)-কে কিয়ামতের দিন আমার জন্য শাফায়াতকারী করুন।'[২]

ওয়াহাবীদের যুক্তিসমূহ

ওয়াহাবীরা তাদের দাবীর সপক্ষে নিম্নোক্ত প্রমাণসমূহ উপস্থাপন করেছে :

১. শাফায়াতের জন্য কোন শাফায়াতকারীকে আহ্বান করা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকার শামিল এবং এটি ইবাদতের ক্ষেত্রে শির্‌ক বলে পরিগণিত। কারণ মহান আল্লাহ্ বলেছেন : و انّ المساجد لله فلا تدعوا مع الله احداً " জসিম য়শ্চনদিসমূহ আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কিছুকে আহ্বান করো না।"[৩]

---

১. জিয়ারাতুল কুবুর, পৃ. ১৫৬।

২. আল হাদিয়াতুস সানিয়া, পৃ. ৪২।

৩. সূরা জীন : ১৮। আয়াতটির বর্ণনাধারা ও বাক্যগঠন থেকে স্পষ্ট যে, " জসিম য়শ্চনদিসমূহ আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট' বাক্যটি 'তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কিছুকে আহ্বান করো না'-বাক্যের নির্দেশের পেছনে বিদ্যমান যুক্তি বর্ণনা করছে। বাক্য দুটির অর্থ হল এরূপ যে, আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ডেকনা, কারণ জসিমদসমূহ আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। যেহেতু মসজিদ হল আল্লাহর সিজদা ও ইবাদতের স্থান এবং সিজদা হল ইবাদতের চূড়ান্ত প্রকাশ সেহেতু ইবাদতের উদ্দেশে আল্লাহর সাথে কাউকে ডেকো না। তাই এ আয়াতে দোয়া ও আহ্বান শব্দের অর্থ হল ইবাদত ও উপাসনা; যেমনটি অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, 'তোমরা আমাকে আহ্বান (আমার নিকট প্রার্থনা) কর, আমি তোমাদের আহ্বানে সাড়া দেব। যারা আমার ইবাদত ও উপাসনা হতে সদম্ভে বিমুখ থাকে

আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কিছুকে ডাকা সার্বিকভাবে হারাম নয় এবং তার অবধারিত পরিণতি শির্‌কে পতিত হওয়া নয়। কারণ যদি কোন ব্যক্তির জন্য কোন কাজ করা বৈধ ও শরীয়তসম্মত হয়, তবে তার নিকট ঐ কাজ করার আহ্বান জানানোও বৈধ ও জায়েয হবে। যদি মহানবী (সা.) ও আল্লাহ্‌র অন্যান্য ওলীদের কিয়ামতের দিন শাফায়াতের অধিকার থাকে, তবে তাঁদের নিকট শাফায়াত করার আবেদন জানানোও শরীয়তসম্মত হবে। প্রকৃতপক্ষে শাফায়াত হলো শাফায়াতের যোগ্য ব্যক্তির জন্য শাফায়াতের অধিকারী ব্যক্তির দোয়া ও আল্লাহ্‌র নিকট তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা। সুতরাং যেমনভাবে প্রত্যেক মুমিনই তার যে কোন মুমিন ভাইয়ের নিকট দোয়া চাইতে পারে–যা ওয়াহাবীরাও বিশ্বাস করে–তেমনি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন (দোয়া করার ও শাফায়াতের অধিকারী) ব্যক্তির নিকট শাফায়াত কামনা করাও জায়েয। তবে শাফায়াত ও কামনা ঐ সকল ব্যক্তির নিকট করতে হবে যাঁদের আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শাফায়াত করার অধিকার রয়েছে, যেমন নবী, ফেরেশতা, ওলী ও পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গ।

তিরমিযী আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূল (সা.)-এর নিকট কিয়ামতের দিন শাফায়াতের আহ্বান জানান।[১]

হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর সন্তানরা তাদের পিতার নিকট তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন,

قَالُوا۟ يَـٰٓأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَـٰطِـِٔينَ ﴿٩٧﴾

"(তারা বলল) হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য (আল্লাহ্‌র নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আমরা ভুল করেছি।"[২]

অন্যত্র আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে আহ্বান জানিয়েছেন তাদের গুনাহসমূহের ক্ষমার জন্য মহানবীর শরণাপন্ন হতে, যাতে তিনি তাদের জন্য ক্ষমা চান,

---

তারা অনতিবিলম্বে লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (মুমিন:৬০) এ আয়াতের প্রথমাংশে আল্লাহকে আহ্বান করতে বলা হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয়াংশে আহ্বান করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার স্থানে ইবাদত করা থেকে মুখ ফিরানোর কথা বলা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় আহ্বান করার অর্থ ইবাদত করা। কারো কাছে দোয়া চাওয়া বা কাউকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করা নয়।-অনুবাদক

১. সহীহ তিরমিযী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪২, 'পুল সিরাত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে' অধ্যায়।

২. সূরা ইউসুফ : ৯৭।

وَلَوۡ أَنَّهُمۡ إِذ ظَّلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ جَآءُوكَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡتَغۡفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابٗا رَّحِيمٗا ٦٤

"যদি তারা নিজেদের উপর জুলুম করার পর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনার জন্য তোমার নিকট আসত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন তবে অবশ্যই তারা আল্লাহ্‌কে ক্ষমাকারী ও দয়ালু হিসেবে পেত।"[১]

যদি ওয়াহাবীরা আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট চাওয়াকে তাঁর মৃত্যুর পর শির্‌ক মনে করে, তবে আমরা বলব, যেহেতু তাদের মতে আল্লাহ্‌ ভিন্ন কাউকে আহ্বান করা সর্বতোভাবে হারাম ও শির্‌ক, সেহেতু তাঁর জীবদ্দশায়ও তা হারাম ও শির্‌ক হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যদিকে প্রমাণিত সত্য যে, রাসূলের দৈহিক মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু তাঁর আত্মা জীবিত এবং দোয়া, শাফায়াত কামনা প্রভৃতি সকল কিছু শ্রবণ রুহ ও আত্মার সাথে সম্পর্কিত, দেহের সাথে নয়। আমরা বারজাখী জীবনের আলোচনায় এ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

২. কোরআনের সাক্ষ্য অনুযায়ী মহান আল্লাহ্‌ রাসূলের সময়সাময়িক যুগের মূর্তিপূজকদের এ কারণে মুশরিক বলেছে যে, তারা খোদা ভিন্ন অন্য কিছুর শাফায়াত কামনা করত।

وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِۚ

"তারা আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য কিছুর উপাসনা করত যা তাদের কোন অকল্যাণ ও কল্যাণ করার ক্ষমতা রাখে না এবং বলত এগুলোই আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের জন্য সুপারিশকারী।"[২]

১. সূরা নিসা : ৬৪।
২. সূরা ইউনুস : ১৮।

আমাদের জবাব

রাসূলের যুগের মুশরিকগণ তাদের উপাস্য মূর্তিগুলোকে তাদের শাফায়াতকারী মনে করত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আয়াতটিতে এটিও বলা হয়েছে যে, তারা ঐ মূর্তিগুলোর উপাসনা করত। যেহেতু তারা তাদের ইবাদত করত ও একই সাথে তাদেরকে শাফায়াতকারী মনে করত সেহেতু আল্লাহ্ তাদের তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন।

উপরন্তু তারা এমন কিছুর জন্য শর্তহীন সুপারিশের অধিকারে বিশ্বাসী ছিল যে, যাদের সুপারিশের কোন অধিকারই আল্লাহ্ দেন নি। এ বিষয়গুলোই তাদের শাফায়াতের বিশ্বাসকে শির্কমিশ্রিত করেছে। কিন্তু যদি কেউ এমন কোন ব্যক্তির জন্য শাফায়াতের অধিকার রয়েছে বলে বিশ্বাস করে যাঁকে স্বয়ং আল্লাহ্ এমন অধিকার দিয়েছেন এবং এ শাফায়াত তিনি আল্লাহ্র অনুমতি সাপেক্ষেই করেন বলে জানে, পরিশেষে এ শাফায়াতের বিশ্বাস শাফায়াতকারীর উপাস্য হওয়াতে পর্যবসিত হয় না, তবে তা কোন অবস্থাতেই হারাম হতে পারে না। অর্থাৎ যদি কেউ শাফায়াতকারীকে উপাস্য মনে না করে এবং এর অধিকারী আল্লাহ্র অনুমতিপ্রাপ্তদের মধ্য হতে হয় তবে তা হারাম হবে না।

৩. পবিত্র কোরআনে শাফায়াতকে আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট বলেছে :

قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَـٰعَةُ جَمِيعًا

"বলুন সকল সুপারিশ আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট।"

উল্লিখিত আয়াত হতে বোঝা যায় শাফায়াত শুধু আল্লাহ্র নিকট চাইতে হবে।

আমাদের জবাব

শাফায়াত যেহেতু মানুষের ভাগ্যের উপর প্রভাবশীল একটি বিষয় এবং মহান আল্লাহ্র প্রতিপালক গুণের একটি প্রকাশ সেহেতু সত্তা ও উৎপত্তিগত দৃষ্টিতে তা আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু এ বিষয়টি তাঁর নবিগণ ও সৎকর্মশীল বান্দাদের শাফায়াতের অধিকারের সঙ্গে অসংগতিশীল নয়। কারণ তাঁরা স্বাধীনভাবে শাফায়াতের অধিকার রাখেন না, বরং আল্লাহ্র ইচ্ছার অধীনে ও অনুমতি সাপেক্ষে শাফায়াত করেন। এ

বিষয়টি পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করেছে من ذا الذى يشفع عنده ألا بإذنه "কে তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে।" এবং ما من شفيع إلا من بعد إذنه "তাঁর অনুমতি ব্যতীত কোন শাফায়াতকারী থাকবে না।" অর্থাৎ তাঁর অনুমতির পরই কেউ শাফায়াত করতে পারবে।

৪. যদিও শাফায়াত কামনা দোয়ার শামিল, কিন্তু মৃত ব্যক্তির নিকট তা কামনা করা বৃথা। কারণ মৃত ব্যক্তি কবরে কিছু শোনে না, কারণ তার জীবন নেই।

উত্তর : আমরা 'মৃত্যু পরবর্তী কবরের জীবনে'র আলোচনায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং প্রমাণ করেছি কবরে মানুষের জীবন রয়েছে। 'মৃতরা শুনতে পায় না'– এ সম্পর্কিত ওয়াহাবীদের উপস্থাপিত আয়াতসমূহের সঠিক ব্যাখ্যাও আমরা উপস্থাপন করেছি।

শাফায়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের যুক্তিসমূহের পর্যালোচনা

১. শাফায়াত গুনাহর প্রতি উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, কারো কারো মতে শাফায়াতের প্রতি বিশ্বাস গুনাহ করার সাহস যোগায় এবং অন্যায়কারীদের ঔদ্ধত্যকে বাড়িয়ে দেয়। তাই তা ইসলামী শরীয়তের প্রাণের সাথে সংগতিশীল নয়।

পর্যালোচনা

প্রথমত যদি এমনটিই হয়ে থাকে, তবে 'তওবা করার সুযোগ দান ও ক্ষমার সুসংবাদও মানুষকে গুনাহ করতে উদ্বুদ্ধ করার কথা ও গুনাহের উদ্দীপক বলে গণ্য হবে। অথচ তওবা হলো ইসলামের অন্যতম মৌলিক বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত এবং সকল মুসলমান এ বিষয়ে একমত।

দ্বিতীয়ত প্রতিশ্রুত শাফায়াতের বিষয়টি তখনই মানুষের মধ্যে ঔদ্ধত্য সৃষ্টি করবে যখন সকল ধরনের অপরাধী ও যে কোন চরম মন্দ কোন বৈশিষ্ট্যের ও যে কোন ধরনের শাস্তিও উপযুক্ত তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে... কিন্তু যখন শাফায়াতের বৈশিষ্ট্যটি অনির্দিষ্ট হবে কোন ধরনের অপরাধী ও কোন কোন গুনাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিয়ামতের দিন কোন সময় (যেহেতু কিয়ামতের প্রতি দিন পৃথিবীর

৫০০০০ বছরের সমান) গৃহীত হবে তা কারো জানা নেই এবং কেউই জানে না তার ভাগ্যে ঐ শাফায়াত জুটবে কি না, তাই শাফায়াতের বিষয়টি গুনাহের প্রতি উৎসাহিত করার সুযোগ নেই।

তৃতীয়ত পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ এবং নিষ্পাপ রাসূল (সা.) ও ইমামদের বাণীসমূহ নিয়ে একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় শাফায়াতের জন্য আল্লাহ্ বিশেষ শর্ত ও বৈশিষ্ট্যের নীতি গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্ বলেন :

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَـٰعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَرَضِىَ لَهُۥ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾

"সেদিন (কিয়ামতের দিন) কারো সুপারিশই ফল বয়ে আনবে না তার সুপারিশ ব্যতীত যাকে পরম করুণাময় অনুমতি দান করবেন এবং তার কথায় সন্তুষ্ট হবেন।[১]

অন্যত্র বলেছেন,

مَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿١٨﴾

"জুলুমকারীদের কোন বন্ধু ও সুপারিশকারী নেই যার সুপারিশ গ্রাহ্য হতে পারে।"[২]

ইমাম সাদিক (আ.) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন,

إنَّ شفاعتنا لن تنالُ مستخفاً بالصلاة

'আমাদের শাফায়াত নামাজের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শনকারীদের জন্য হবে না।'[৩]

সুতরাং সুস্পষ্ট যে এ সকল শর্ত কাউকে গুনাহ করতে উৎসাহিত করতে পারে না। বরং মানুষকে আল্লাহ্র আনুগত্য অর্জনে প্রচেষ্টা চালাতে উদ্বুদ্ধ করে যাতে করে নবী (সা.) ও আল্লাহ্র ওলীদের শাফায়াতের উপযুক্ত হতে পারে।

চতুর্থত শাফায়াতের প্রতিশ্রুতি মানুষকে গুনাহ করতে উৎসাহিত তো করেই না, বরং গুনাহকারীকে ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে আশাবাদী করে এভাবে যে, তার মধ্যে বিশ্বাস জন্মায় সে নিজের ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পারবে। কারণ তার অতীতের মন্দকর্ম তার ভাগ্যের উপর অবিচ্ছেদ্য কালো পর্দা টেনে দেয় নি, তাই সে আল্লাহ্র ওলীদের

১. সূরা ত্বাহা : ১০৯।
২. সূরা মুমিন : ১৮।
৩. বিহারুল আনওয়ার, ৮২তম খণ্ড, পৃ. ২৩৫।

সাহায্য নিয়ে এবং আল্লাহ্‌র পথে চলার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করে নিজের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করতে পারবে এমন বিশ্বাস করে। সুতরাং শাফায়াত তাদের মধ্যে এ আশা জাগরুক রাখে যে, আল্লাহ্‌র ওলীদের দোয়ার বরকতে ক্ষমা লাভের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ তাদের রয়েছে।

২. শাফায়াত পক্ষপাতিত্বমূলক মধ্যস্থতা গ্রহণের শামিল

বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা

কারো কারো মতে শাফায়াত হলো এক প্রকার পক্ষপাতিত্ব এবং এ লক্ষ্যে একদল মধ্যস্থতাকারীর শরণাপন্ন হওয়া। ফলে একদল ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ন হয় এবং এর মাধ্যমে আইনকে কলুষিত করা হয়। কিন্তু বস্তুত শাফায়াত আল্লাহ্‌র ওলীদের হতে ঐ সকল গুনাহগারের জন্য বিশেষ সাহায্য যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর ওলীদের সঙ্গে সর্ম্পকচ্ছেদ করে নি। প্রকৃত শাফায়াত তাদের ভাগ্যেই জুটবে যাদের হৃদয়ে ও মানসে পবিত্রতা ও পূর্ণতার প্রতি ঝোঁক রয়েছে। কিন্তু যাদের কোনরূপ ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য নেই তাদের অন্ধকার হৃদয়ে শাফায়াতকারীদের ঐশী আলো প্রতিফলিত হবে না ও তাদের হৃদয় আলোকিতও হবে না।

সুতরাং সাধারণ মানুষদের মাঝে সুপারিশের নামে প্রচলিত পক্ষপাতিত্বের সাথে ইসলামের শাফায়াতের ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। যেমন,

১. পৃথিবীতে প্রচলিত সুপারিশের ক্ষেত্রে অপরাধী ব্যক্তি নিজে সুপারিশকারীকে মনোনিত করে কোন বিশেষ বিভাগের প্রধানের কাছে সুপারিশ করবে। যেহেতু সুপারিশকারীর ঐ প্রতিষ্ঠানে বিশেষ প্রভাব রয়েছে, সেহেতু সে যেন সেই প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে তার অপরাধ ক্ষমা করিয়ে দেয় এবং তার উপর প্রযোজ্য আইনের বিধানকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়ার লক্ষ্যে সে এ পদক্ষেপ নেয়। কিন্তু ইসলামী শরীয়তে শাফায়াতের মূল চাবিকাঠি ও ক্ষমতা আল্লাহ্‌র হাতে ন্যস্ত এবং তিনিই শাফায়াতকারীকে মনোনীত করেন। মহান আল্লাহ্‌ পূর্ণতা ও মর্যাদার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শাফায়াতকারীকে শাফায়াতের অধিকার দেন এবং মনোনীত শাফায়াতকারীর মাধ্যমে নিজের রহমত ও ক্ষমাকে বান্দাদের মধ্যে বণ্টন করেন।

২. ইসলামের শাফায়াতের ক্ষেত্রে শাফায়াতকারী প্রভু বা পালনকর্তা হতে এই অধিকার লাভ করেন। কিন্তু পৃথিবীতে প্রচলিত সুপারিশের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ক্ষমতা সুপারিশকারীর হাতে ন্যস্ত এবং সে আইনের বিরুদ্ধে তার ইচ্ছামত অন্যায় সুপারিশ করে। সে তার প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে বিচারককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যায় বিচারে বাধ্য করে। কিন্তু ঐশী সুপারিশে মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও ইচ্ছার বিপরীতে কিছুই ঘটে না, শুধু কাঙ্ক্ষিত বিষয়টির পরিবর্তন সাধিত হয়।

৩. পৃথিবীতে প্রচলিত সুপারিশসমূহ মূলত আইনের ক্ষেত্রে বৈষম্যতে পর্যবসিত হয়। এটি এভাবে ঘটে যে, সুপারিশকারী আইন প্রণয়নকারী অথবা আইন বাস্ত-বায়নকারীর উপর প্রভাব বিস্তার করে, ফলে আইনের প্রয়োগ শুধু দুর্বল ও ক্ষমতাহীনদের উপর কার্যকর হয়। এর বিপরীতে ঐশী শাফায়াত কিয়ামতের দিন কোন ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র উপর প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না এবং কোন অবস্থাতেই আইনের বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। তাই শাফায়াত হলো আল্লাহ্‌র অসীম রহমত ও ক্ষমার উপযুক্ত ব্যক্তিকে পবিত্রকরণের প্রক্রিয়া। এ কারণেই একদল লোক কিয়ামতের দিন শাফায়াত হতে বঞ্চিত থাকবে, কারণ তারা এতটা পাপিষ্ঠ যে, আল্লাহ্‌র অসীম রহমতেরও অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র নীতিতে কোন বৈষম্য নেই।

৪. শাফায়াত লাভকারী ব্যক্তিকে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে। যেমন :

ক. আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন এবং সেও আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয়ে ভীত থাকবে

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾

"তারা (ফেরেশতারা) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি প্রাপ্তদের ব্যতীত অন্যদের জন্য সুপারিশ করবে না এবং তারা তাঁর শাস্তি-র ভয়ে ভীত।"[১]

খ. আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী হওয়া, যেমন তাঁর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর একত্বে বিশ্বাসী হওয়া। তাঁর প্রেরিত নবীকে সত্যায়ন করা, নবীর স্থলাভিষিক্ত ইমামদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করা এবং সৎকর্মশীল হওয়া। আল্লাহ্ বলেছেন :

১. সুরা আম্বিয়া : ২৮।

لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَـٰعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَـٰنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾

অর্থাৎ "যে করুণাময় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন, সে ব্যতীত আর কেউ শাফায়াতের অধিকারী হবে না। (সূরা মারিয়াম : ৮৭)

গ. পাপিষ্ঠ ও অত্যাচারী হওয়া যাবে না :

مَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿١٨﴾

"জুলুমকারীদের কোন বন্ধু ও সুপারিশকারী নেই যার কথা শ্রবণ করা হবে।"

ঘ. নামাজের ক্ষেত্রে শিথিলতা করবে না :

إنَّ شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلوة

'নিশ্চয়ই আমদের শাফায়াত নামাজের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শনকারীদের ভাগ্যে জুটবে না।[১]

সুতরাং শাফায়াত গুনাহের প্রতি উৎসাহ দানকারীও নয় এবং অন্যায়ের প্রতি সবুজ সংকেত দানও নয়। এটি পক্ষপাতিত্বমূলক মধ্যস্থতাও নয়। সৎকর্ম থেকে ফিরিয়ে রাখার উপকরণও নয়, বরং এর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণমূলক ও গঠনমূলক ভূমিকা রয়েছে। এভাবে এরূপ কয়েকটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে :

ক. আশাকে জাগরুক রাখা

প্রধানত মানুষের উপর তার মন্দ প্রবৃত্তির প্রভাবের কারণে মানুষ বড় ধরনের গুনাহে লিপ্ত হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে তার হৃদয়ের উপর হতাশার ছায়া পড়ে। এই হতাশাই তাকে আরো অপরাধে কলুষিত হতে বাধ্য করে। এই হতাশার বিপরীতে আল্লাহ্‌র ওলীদের শাফায়াতের আশা তাকে আরো অধিক গুনায় পতিত হওয়া হতে রক্ষা করে এভাবে যে, তাকে আশা দেয় যদি সে নতুন করে গুনায় পতিত না হয় ও নিজেকে সংস্কারে ব্রত হয়, তাহলে সম্ভাবনা রয়েছে মহান আল্লাহ্ কর্তৃক পবিত্র ব্যক্তিবর্গদের শাফায়াতের বদৌলতে তার পূর্ববর্তী কর্মসমূহকে ক্ষমা করে দেয়ার।

১. বিহারুল আনওয়ার, ১১তম খণ্ড, পৃ. ১০৫।

খ. আল্লাহ্‌র ওলীদের সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন

নিশ্চিতভাবে যে ব্যক্তি শাফায়াতের আশা রাখে সে প্রচেষ্টা চালায় আল্লাহ্‌র ওলীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের। ফলে যে সকল কাজ তাদের খুশী করে তা করার চেষ্টা করে যাতে করে এই সম্পর্ক দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন না হয়।

গ. শাফায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ অর্জনের প্রচেষ্টা

শাফায়াতের আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি তার পূর্ববর্তী কর্মসমূহের বিষয়ে নতুন করে চিন্তা করে ভবিষ্যতের জন্য উন্নততর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কারণ উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত ব্যতিরেকে শাফায়াত লাভ করা যায় না। বস্তুত শাফায়াত একটি বিশেষ অনুগ্রহ যা একদিকে শাফায়াত লাভকারী ব্যক্তির মধ্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়া এবং অন্যদিকে শাফায়াতকারী ব্যক্তির সৎকর্ম ও আল্লাহ্‌র নিকট সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার সমন্বয়ে সাধিত হয়ে থাকে।

৩. আমাদের জন্য সুপারিশকারীর প্রয়োজন কেন?

কেউ কেউ এ প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, কেন আল্লাহ্ সরাসরি আমাদের গুনাহসমূহকে ক্ষমা না করে সুপারিশকারীর মধ্যস্থতায় তা করবেন?

উত্তর : মহান আল্লাহ্ বিশ্বজগতকে সর্বোত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন :

الذى أحسن كلَّ شىءٍ خلقه "যিনি সকল কিছুকে সর্বোত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন।"[১]

বিশ্বজগৎ মানুষের পথপ্রাপ্তি, পূর্ণতা ও বিকাশের লক্ষ্যে কার্যকারণের নীতির ভিত্তিতে সৃষ্ট হয়েছে। এখানে মানুষের সকল প্রাকৃতিক চাহিদা সাধারণ উপায় উপকরণের মাধ্যমে পূরণ হয়ে থাকে।

আল্লাহ্‌র অবস্তুগত নিয়ামতসমূহ, যেমন পথ নির্দেশনা, ক্ষমা লাভ প্রভৃতি বিশেষ প্রক্রিয়ায় মানুষের উপর অবতীর্ণ হয়ে থাকে। কারণ প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এটাই যে, তাঁর আধ্যাত্মিক নিয়ামতগুলো বিশেষ মাধ্যমের দ্বারা মানুষের জন্য আসবে। সুতরাং বস্তুগত নিয়ামতের বিষয়ে যেমন প্রশ্ন করা যায় না যে, কেন আল্লাহ্ পৃথিবীকে

১. সূরা সিজদা : ৭।

সূর্য দ্বারা আলোকিত করেছেন, কেন সরাসরি (বস্তুর সাহায্য ছাড়া) আলোকিত করলেন না? তেমনি অবস্তুগত নিয়ামতের ক্ষেত্রেও এ প্রশ্ন সঠিক নয় যে, কেন আল্লাহ্ তাঁর ওলীদের মাধ্যমে নিজ ক্ষমা বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন?

শহীদ আয়াতুল্লাহ্ মুর্তাজা মুতাহ্হারী বলেছেন, 'মহান আল্লাহ্র কর্ম শৃঙ্খলাপূর্ণ। যদি কেউ বিশ্বের শৃঙ্খল-ব্যবস্থার প্রতি উপেক্ষার ভাব দেখায় তবে সে বিচ্যুত। এ কারণেই মহান আল্লাহ্ গুনাহকারী ব্যক্তিকে নির্দেশনা দিয়ে নিজের উপর জুলুম করে থাকলে তার ক্ষমার জন্য রাসূল (সা.)-এর দ্বারস্থ হওয়ার কথা বলেছেন যাতে করে তিনি তার জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলেন:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾

"যদি তারা (গুনায় পতিত হওয়ার মাধ্যমে) নিজের উপর জুলুম করে আপনার নিকট আসে এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবে অবশ্যই তারা আল্লাহ্কে তওবা গ্রহণকারী ও দয়ালু হিসেবে পেত।' [১]

...শাফায়াতের অন্যতম কারণ হলো মহান আল্লাহ্ তাঁর নবী ও ওলিগণকে শাফায়াতের অধিকার দানের মাধ্যমে সম্মানিত করতে চেয়েছেন। তাঁদের প্রার্থনা ও আবেদন গ্রহণ তাঁদের প্রতি এক প্রকার মর্যাদা দানের শামিল। যেহেতু আল্লাহ্র ওলী, সৎকর্মশীল বান্দা, ফেরেশতামণ্ডলী এবং আরশ বহনকারী বিশেষ ফেরেশতাগণ সমগ্র জীবন আল্লাহ্র নির্দেশের অনুগত থেকে জীবন কাটিয়েছেন এবং কখনোই আল্লাহ্র বন্দেগী, আনুগত্য ও উপাসনার গণ্ডির বাইরে পা বাড়ান নি, সেহেতু তাঁরা সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত। তাঁদের মর্যাদা দানের ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় কী হতে পারে যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও ক্ষমা পাওয়ার উপযুক্ত পাপী বান্দাদের তাঁদের দোয়ার বরকতে ক্ষমা করা হবে ও তাঁদের প্রার্থনা আল্লাহ্ কর্তৃক গৃহীত হবে।

১. মাজমুয়ে আসার, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৩।

৪. শাফায়াত আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও ইচ্ছার মধ্যে পরিবর্তনকারী অর্থাৎ তাঁর সর্বজ্ঞ হওয়ার পরিপন্থী

রশিদ রেজা বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র বিধানই হলো ন্যায় এবং ঐশী কল্যাণের নীতির ভিত্তিতে তা প্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে শাফায়াত বা সুপারিশ বলে যে বিষয়টি মানুষের মাঝে প্রচলিত আছে তার অর্থ হলো মধ্যস্থতা ও সুপারিশকারী অপরাধীর উপর প্রকৃত বিধান কার্যকর হওয়ার প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। যদি সুপারিশের পর বাস্তবায়িত বিধানটি ন্যায়ের অনুরূপ হয় তবে যেহেতু প্রথম বিধানটি (সুপারিশের পূর্বের) তার বিপরীত ছিল তাই সেক্ষেত্রে দু'টি অবস্থা হতে পারে :

১. মহান আল্লাহ্‌কে ন্যায়পরায়ণ নন বলতে হবে, যা অবশ্যই ঠিক নয়।

২. বলতে হবে আল্লাহ্‌ ন্যায়পরায়ণ, তবে তাঁর জ্ঞান অপূর্ণ ছিল। কারণ সুপারিশকারীর সুপারিশের পর তাঁর সিদ্ধান্ত ও জ্ঞানে পরিবর্তন এসেছে ও বাস্তবায়নযোগ্য ন্যায়সঙ্গত নতুন বিধান তাঁর হস্তগত হয়েছে।

এইরূপ চিন্তা অগ্রহণযোগ্য। কারণ আল্লাহ্‌র জ্ঞান তাঁর সত্তাগত এবং তাতে কোন পরিবর্তন আসতে পারে না। যদি ধরে নিই প্রথম বিধানটিই ন্যায় ছিল এবং দ্বিতীয় বিধানটি তার বিপরীত, তাহলে বিষয়টি দাঁড়াবে আল্লাহ্‌ শাফায়াতকারীর প্রতি ভালোবাসার কারণে ন্যায়কে পদদলিত করে নতুন বিধান কার্যকর করেছেন। এইরূপ চিন্তা আল্লাহ্‌র ন্যায়পরায়ণতার নীতির পরিপন্থী। তাই শাফায়াতের বিষয়টি বিভিন্নমুখী প্রশ্নের সম্মুখীন এবং যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি তার বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে।[১]

আমাদের জবাব

এই সমালোচনাটির উদ্ভব এজন্য হয়েছে যে, সমালোচক জ্ঞানের বিষয়বস্তুর মধ্যে পরিবর্তনকে আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও ইচ্ছার মধ্যে পরিবর্তন ভেবে নিয়েছেন। অর্থাৎ এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আমাদের বুঝতে হবে যে, বিষয়টির মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে, তা হলো অপরাধী ও পাপীর অবস্থার অর্থাৎ তার অবস্থার পরিবর্তনের ফলে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের উপযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ পূর্বে তার মধ্যে এ

১. তাফসীরে আল মিনার, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩০৭।

অবস্থা বিরাজমান ছিল না। তাই আল্লাহ্‌র জ্ঞানে কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নি। সুতরাং আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে পূর্বেই দু'ধরনের ইচ্ছা ছিল এবং আল্লাহ্ পূর্ব হতেই জানতেন ঐ ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তন আসবে এবং তাঁর দ্বিতীয় ইচ্ছার অধীনে সে রহমতে শামিল হবে। তাই তাঁর ইচ্ছার মধ্যে কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নি, বরং দু'টি স্বতন্ত্র ইচ্ছা দু'টি ভিন্ন বিষয়ের উপর কার্যকর যার কোনটিই অপরটিকে প্রত্যাখ্যান করে না। বরং দু'টিই তাঁর ন্যায়ের অনুগত। এ কারণেই এতে আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও ইচ্ছার মধ্যে কোন পরিবর্তনের সম্ভাবনা আসে না। বরং নতুন জ্ঞান ও ইচ্ছা নতুন এক বিষয়ের উপর আরোপিত হয় যা পূর্ব হতেই তিনি জ্ঞাত। যেমন আমরা জানি যে, রাত্রিতে সকল স্থান অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে তাই এই জ্ঞানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিই যে, তখন বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহার করব। আবার জানি যে, সকালে সূর্য উদিত হবে, তখন বৈদ্যুতিক আলো নিভিয়ে ফেলব। এই দুই জ্ঞান পরস্পর বিপরীত নয়, বরং বিষয়বস্তুর ভিন্নতায় ভিন্নরূপ বিধি বা নীতির প্রয়োগ হয়েছে মাত্র।

শাফায়াতের ক্ষেত্রেও আমরা বলি যে, মহান আল্লাহ্ পূর্ব হতেই জানতেন কোন্ ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং তার বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র বিশেষ ইচ্ছা তার উপর প্রযোজ্য হবে। ফলে অবস্থা ও বিষয়ের পরিবর্তনে তার উপর বিভিন্ন রূপ ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটবে। তাই এক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র আদি ও অনন্ত জ্ঞান ও ইচ্ছায় কোন পরিবর্তন ও ভুলের বিষয় উত্থাপনের সুযোগ নেই। কারণ প্রতিটি জ্ঞানই তার নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য সঠিক এবং প্রতিটি ইচ্ছাই কল্যাণের নীতিতে তার উপযুক্ত বিষয়বস্তুর জন্য প্রাজ্ঞজনোচিত।

সুতরাং মহানবী (সা.), আল্লাহর ওলী ও সম্মানিত বান্দাদের জন্য কিয়ামতের দিন শাফায়াতের বিষয়টি স্বীকৃত অর্থাৎ তাঁদের সুপারিশের অধিকার রয়েছে তাই মুমিনদের জন্য তাঁদের নিকট সুপারিশ কামনা বৈধ ও জায়েয হবে, যেমন মুমিনদের জন্য দোয়ার ক্ষেত্রেও এমন বিধান রয়েছে।

আল-কোরআনে গাদীরের ঐতিহাসিক ঘোষণা

অধ্যাপক আবদুল মাজিদ যাহাদাত

সারাংশ : দশম হিজরির ১৮ যিলহজে মহানবি (সা.) কাফেলাসহ গাদীরে খুমে প্রবেশের প্রাক্কালে সূরা মায়েদার ৬৭ নং আয়াত অবতীর্ণ হওয়া এবং রাসূল (সা.) হযরত আলীকে (আ.) মুমিনদের নেতা ও মাওলা ঘোষণা করার পর সূরা মায়িদার ৩ নং আয়াতের যে অংশে দ্বীনের পূর্ণতা ও নেয়ামতের সমাপ্তির কথা বলা হয়েছে তা অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক রয়েছে। এ দুই আয়াতের শানে নুযুল এবং সার্বিক অর্থ থেকে হযরত আলী (আ.)-এর বেলায়েতের বিষয়টি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়।

মূল প্রবন্ধ : এ আলোচনায় আমরা পবিত্র কোরআন মজীদে গাদীরের ঐতিহাসিক ঘোষণা সম্পর্কিত দুটি আয়াতের–'আয়াতে তাবলীগ' ও 'দ্বীন পরিপূর্ণ হওয়া'–দিকে দৃষ্টিপাত ও সেগুলোর বিশ্লেষণ করব।

কোরআনের যেসব আয়াত গাদীরের ঘোষণার পূর্বে ও পরে নাযিল হয়েছে এবং উক্ত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত রয়েছে, সেগুলো গাদীর বিষয়ক আয়াত হিসাবে পরিচিত। গাদীরের বিষয় মূলত কারো প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের লক্ষ্যে ঘোষিত হয় নি; বরং তা রাসূল (সা.) কর্তৃক তাঁরই স্থলাভিষিক্তের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হিসাবে প্রচারিত হয়েছে।

আয়াতে তাবলীগ বা তাবলীগের আয়াত

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٦٧

'হে রাসূল! পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি তা (মানুষের নিকট) না পৌঁছান, তবে আপনি তাঁর রেসালাতের দায়িত্ব কিছুই পালন করলেন না। আর আল্লাহ আপনাকে মানুষদের থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ একগুঁয়ে-কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না!'[১]

শানে নুযুল

আয়াতে তাবলীগের শানে নুযুল সম্পর্কিত রেওয়ায়াতসমূহ যা আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.)-এর নেতৃত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত সেগুলো খুবই নির্ভরযোগ্য।[২]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বিদায় হজ্ব শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পথে 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে পৌঁছলে ১০ম হিজরির জিলহজ্ব মাসের আঠারো তারিখে এই আয়াত নাযিল হয়। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে বলেন : 'হে মুহাম্মাদ (সা.)! আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি যেভাবে দরুদ পাঠিয়ে থাকেন, সেভাবেই দরুদ পাঠিয়েছেন। অতঃপর বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! প্রচার করুন যা কিছু আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে, আলী (আ.)-এর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। যদি আপনি এই নির্দেশ পালন না করেন তবে যেন আপনি রেসালাতের কোন দায়িত্বই পালন করলেন না!'

ঐ সময়ে তাৎক্ষণিকভাবে রাসূল (সা.) মদীনার দিকে অগ্রসরমান তাঁর কাফেলা যা জোহফা নামক স্থানের নিকটবর্তী ছিল এবং যার সদস্য সংখ্যা এক লক্ষ বা তারও বেশি ছিল, তাদের সকলকে এ মর্মে নির্দেশ পাঠালেন যে, যাঁরা গাদীরে খুম ছেড়ে অগ্রসর হয়েছেন তাঁরা যেন ফিরে আসেন এবং যাঁরা উক্ত স্থান থেকে পেছনে পড়ে আছেন তাঁরা যেন উক্ত নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে যান! অতঃপর রাসূল (সা.) সেখানেই আল্লাহ তা'আলা হযরত আলী (আ.)-এর সম্পর্কে যে নির্দেশ পাঠিয়েছেন, তা প্রচারের আয়োজনে নিয়োজিত হন। এ সময় হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূল (সা.)-কে নিশ্চয়তা দেন যে, আল্লাহ তাঁকে মানুষের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করবেন।[৩]

আয়াতের শব্দাবলির অর্থের ওপর আলোকপাত

এখন আমরা উক্ত আয়াতের কিছু শব্দের দিকে দৃষ্টি দেব এবং দেখব যে, সেগুলো কী নির্দেশ করছে–

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.)-এর বেলায়াত (কর্তৃত্ব) ও ইমামত সম্পর্কে এ আয়াতের শানে নযুলের বর্ণনা ছাড়াও উক্ত আয়াতের কিছু শব্দের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, বিষয়টা সম্পূর্ণ পূর্ব নির্ধারিত এক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ছিল এবং এটা রাসূলের পরবর্তী ইসলামি সমাজের নেতৃত্ব নির্ধারণ ও তাঁর স্থলাভিষিক্তের ঘোষণার যথাযথ বাস্তবায়ন ছাড়া অন্য কোন বিষয় ছিল না! উদাহরণস্বরূপ : يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ

কোরআনুল কারীমে মহানবী (সা.)-কে বিভিন্নরূপ শব্দগুচ্ছ দ্বারা সম্ভাষণপূর্বক নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। যেমন : يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ / يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ / يأيها النبي এ ধরনের প্রতিটি আহ্বান বা সম্বোধনবোধক শব্দ সর্বদা তার উপযুক্ত বিষয়াবলির সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে 'ইয়া আইয়্যুহাল রাসুল' শিরোনামের সম্বোধনটি থেকে বোঝা যায় এতে 'রেসালাতের প্রচার' এর সাথে সম্পর্কিত বিষয় বিবৃত হয়েছে! একই ভাবে তাতে অধিক গুরুত্বারোপ করে বলা হয়েছে যে, এই তাবলীগ (প্রচার) না করা হলে, রেসালাতের কোন কার্যই যেন সম্পাদিত হয় নি! বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এবং বিরোধিতাকারীদের শত্রুতার প্রবল শঙ্কা থাকায় এভাবে সম্ভাষণ করে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে যে, এরূপ নতুন বিষয়ের অবতরণা করা ও তা বাস্তবায়নের কঠিনতা বা চ্যালেঞ্জ সহ্য করার শক্তি তাঁকে প্রদান করা হবে।[৪]

مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ: উল্লিখিত আয়াতের এ অংশে যে বিষয়টি প্রচার করতে বলা হয়েছে তা উল্লেখ না করে যদিও উহ্য রাখা হয়েছে, এভাবে তার গুরুত্বের প্রতি বিশেষ ভাবে ইশারা করা হয়েছে এবং রেসালাতের উপযুক্ত হিসাবে যে ভাবে ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে ঠিক সে ভাবেই এ বিষয়টার প্রতিও ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ সুস্পষ্ট যে, এটা এমন একটা বিষয়ের নির্দেশ, যার উপর রাসুলে খোদাকে কোন রূপ এখতিয়ার বা স্বাধীনতা দেওয়া হয় নি; বরং তা সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশকৃত। আর এ নির্দেশ রাসুলের জীবদ্দশায় তারই পবিত্র-মুখে ঘোষণা করতে হবে।[৫]

وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ- এ বাক্যাংশে অন্য একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, আর তা হলো : রাসূল (সা.)-এর ওপর যে বিষয়টি প্রচারের দায়িত্ব রয়েছে তা প্রকৃত অর্থে রেসালাতের ভিত্তি বা স্তম্ভস্বরূপ। আর এটা এই কথার

মধ্যে ফুটে উঠেছে যে, যেহেতু বলা হয়েছে, যদি রাসূল (সা.) এ দায়িত্ব পালন না করেন তবে যেন তিনি নিজ রেসালাতের কোন দায়িত্বই পালন করলেন না![৬]

যেহেতু এ আয়াতটি সূরা মায়েদার অন্তর্ভুক্ত এবং সূরা মায়েদা সর্বশেষ নাযিল হওয়া সূরাগুলোর অন্যতম আর ইতিমধ্যে ইসলামের সকল গুরুত্বপূর্ণ আহকামের নির্দেশগুলোও বর্ণিত হয়ে গেছে, তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বিষয়টি অবশ্যই নামাজ-রোজা-হজ্ব-যাকাত বা এসবের অনুরূপ কোন কিছুর নির্দেশ ছিল না![৭]

وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ- এই বাক্যাংশের عصمت শব্দটি ইসমে মাসদার যা (ع–ص–م) হুরুফে আসলি (বর্ণগুলো) থেকে গৃহীত হয়েছে এবং এর অর্থ হলো– দূরে রাখা বা সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।[৮]

অতএব, এ আয়াতে عصمت শব্দটি মানুষের ক্ষতি থেকে দূরে রাখা বা সংরক্ষণ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে ক্ষতির অর্থ রাসূলের পবিত্র জীবনের প্রতি হুমকি ও তাঁর পবিত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্যর প্রতি বাধা হওয়া। এ অংশটি পরিষ্কার ভাবে ইঙ্গিত করে এটি এমনই একটি বিষয় ছিল যে, কিছুসংখ্যক লোকের উক্ত বিষয়ের বিপক্ষে শক্ত অবস্থান রয়েছে যা রাসূলের জীবনকে হুমকির সম্মুখীন করতে পারে। অতএব, এখানে এ সকল ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।[৯]

রাসূলের দুশ্চিন্তার কারণ

তৎকালীন নতুন মুসলমানদের মধ্যে পূর্ব থেকে বিদ্যমান মন-মানসিকতা, স্বভাব-প্রকৃতি, জাহেলিয়াতের রীতিপ্রথাসমূহ এবং গোত্রপ্রীতি– এসবের দিকে দৃষ্টি রেখে এবং বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে মুনাফিকদের উপস্থিতির[১০] বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে রাসূল (সা.) এরূপ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। কারণ, সম্ভাবনা ছিল যে, এ সকল লোক আল্লাহর নির্দেশকে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়ে জাহেলিয়াতের অনুসরণ করে বসবে! তাবলীগের আয়াতের শানে নযুল সম্পর্কিত যেসব রেওয়ায়াত এসেছে সেগুলোতে রাসূলের দুশ্চিন্তার উপকরণ উল্লিখিত হয়েছে।[১১]

আয়াতে তাবলীগ সম্পর্কে ইমামদের বক্তব্য দলিলস্বরূপ

আয়াতে তাবলীগের শানে নযুল ও আয়াতের মধ্যকার শব্দাবলি থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে যে, উক্ত আয়াতের লক্ষ্য ইমামত ও রাসূলের স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করা। আর এ কথাটি ইমামদের বিভিন্ন বক্তব্যে আরো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। কোন এক ব্যক্তি ইমাম রেযা (আ.)-কে বলল : 'হে রাসূলের সন্তান! উরউয়া ইবনে জোবায়ের থেকে এরূপ বর্ণনা করা হয় যে, রাসূলে খোদা (তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিয়োগের বিষয়ে) তাকিয়া (সতর্কতার লক্ষ্যে কোন কিছু গোপন করা) অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন।' জবাবে ইমাম বলেন : 'যদি তর্কের খাতিরে এ কথা সত্য বলে মেনেও নেই যে, রাসূল (সা.) আল্লাহর সরাসরি নির্দেশ প্রাপ্তির পূর্বে অনুরূপ করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে মহান আল্লাহ এই আয়াত-

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿٦٧﴾

'হে রাসূল! পৌঁছে দিন, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি তা মানুষের নিকট না পৌঁছান, তবে আপনি তাঁর রেসালাতের দায়িত্ব কিছুই পালন করলেন না। নিশ্চয় আল্লাহ একগুঁয়ে কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না!' (আল মায়েদাহ : ৬৭)–নাযিল করে জনগণ ও রাসূল (সা.)-এর মধ্যে উক্ত বিষয়ে যে তাকিয়া ছিল তা উঠিয়ে নিয়েছেন এবং রাসূল (সা.) তা যথাযথ ভাবে প্রচার করেছেন। কিন্তু রাসূলের মৃত্যুর পর কুরাইশরা (তাঁর নির্দেশ অমান্য করে) নিজেদের পছন্দমতো কাজ সম্পাদন করেছিল।'[১২]

অন্যান্য শানে নযুল

ইমামীধারার মতানুযায়ী এ আয়াতটির শানে নযুল হলো : এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আলী (আ.)-এর ইমামতের ঘোষণার নির্দেশের প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে। তবে এর বিপরীতে আহলে সুন্নাতের কিছু মত রয়েছে, যেমন বলা হয়ে থাকে যে,

১. ইসলাম ও মুসলমাদের দুই বড় শত্রু ইয়াহুদি-নাসারা যারা সর্বদা বড় বাধা হিসাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করত এবং ইসলামের উন্নতি ও অগ্রগতি রোধ করার জন্য যে প্রচেষ্টা নিত তারই প্রতি ইঙ্গিত করে এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এ বিষয়টিই রাসূলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত ছিল– আয়াতে যাদের ক্ষতি থেকে রক্ষার কথা বলে তাঁকে নিশ্চিন্ত করা হয়। অতএব, বেলায়াতের (কর্তৃত্বের) সাথে এ আয়াতের কোন সম্পর্ক আছে কি?

জবাব : ইয়াহুদি-নাসারাদের সরাসরি শত্রুতার বিষয় ১০ম হিজরি সালের পূর্বেই (৭ম হিজরিতে খায়বারের যুদ্ধে পরাজয়ের পর) সমাধান হয়ে গিয়েছিল। কারণ, তাদের অধিকাংশই ইসলামের আধিপত্যকে মেনে নিয়েছিল আর বাকিরা (বনি নাযির, বনি কায়নুকা ও বনি কুরায়যা) অন্যত্র নির্বাসিত হয়ে চলে যায়। আর নাজরানসহ অন্যান্য অঞ্চলের খ্রিস্টানরা শক্তিহীন হয়ে জিযিয়া কর দিয়ে ইসলামি সরকারের অধীনে বাস করছিল। তাই সূরা মায়েদার ৪১ নং আয়াত অনুসারে বলা যায় যে, রাসূল (সা.)-এর এ শঙ্কা ইয়াহুদি-নাসারাদের মতো বহিঃশত্রুদের থেকে ছিল না; বরং তা ছিল মুসলমানদের একদল থেকেই–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحۡزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡكُفۡرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَلَمۡ تُؤۡمِن قُلُوبُهُمۡۛ

'হে রাসূল! তাদের জন্য দুঃখ করবেন না যারা দৌড়ে গিয়ে কুফ্‌রে পতিত হয় এবং যারা মুখে বলে : 'আমরা মুসলমান, অথচ তাদের অন্তর ঈমান আনে নি!'" (সূরা মায়েদা : ৪১)

২. উক্ত আয়াতের পূর্বাপর আয়াতের সংশ্লিষ্ট বিষয় : কিছুসংখ্যক লোক বলে থাকেন আয়াতের পূর্বাপরের ধারাবাহিকতা বা রীতি অনুসারে আয়াতটি আহলে কিতাবগণের সাথে সংশ্লিষ্ট, ফলে ইমামত বা খেলাফতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কারণ, আহলে কিতাবদের আলোচনার মধ্যে ইমামত বা খেলাফতের বিষয় নিয়ে আসা একপ্রকার দ্বিমুখিতা যা কোরআনের বালাগাত ও ফাসাহাতের (সাহিত্যমান ও অলঙ্কারশাস্ত্রের নীতির) পরিপন্থী।

জবাব : যেহেতু কোরআনের আয়াতগুলো ধাপে ধাপে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজন অনুসারে নাযিল হয়েছিল, সেহেতু দেখা যায় যে, একই সূরার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিষয়াবলির বর্ণনা রয়েছে। যেমন একই সূরার কিছু আয়াতে ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে; পরক্ষণে দেখা যাবে পরবর্তী আয়াতগুলোতে ইসলামি শরীয়তের আহকাম বর্ণিত হচ্ছে। অথবা দেখা যায় যে, আগের আয়াতগুলোতে হয়তো মুনাফিকদের নিয়ে কিছু বলা হয়েছে; পরক্ষণে মুমিনদের উদ্দেশে কথা বলা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে কোরআন কখনই সেই ক্লাসিক গ্রন্থের মতো নয় যাতে পূর্ব থেকে সুনির্দিষ্ট একক কোন বিষয় ঠিক করে নেওয়া হয়েছে।[১৩] (তবুও দাবি করা যায়, আয়াতটির পূর্ব ও পরবর্তী আয়াতগুলোতে যে ইয়াহুদিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে তাদের সাথে মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান মুনাফিকদের সম্পর্ক ও বেলায়াত প্রতিষ্ঠার পথে বাধা সৃষ্টির কাজে তাদের পরস্পরের যোগসাজস থাকার কারণে আয়াতটি নাযিলের দৃষ্টিতেও তার উপযুক্ত স্থানে স্থান পেয়েছে।)

দ্বীন পরিপূর্ণতার আয়াতের বিশ্লেষণ

ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا ۚ

'আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব, তাদেরকে ভয় করো না বরং আমার অবাধ্য হওয়াকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।'[১৪]

শানে নযুল

আহলে সুন্নাতের বিখ্যাত আলেমগণ, যেমন মোহাম্মাদ বিন জারির তাবারী (৩১০) তাঁর 'বেলায়াত' পুস্তকে, হাকেম নিশাবুরী (মৃত্যু ৪৫০) তাঁর 'আল মুসতাদরাক আলাস সাহিহাইন' গ্রন্থে, আবু নাইম ইসফাহানী (মৃত্যু ৪৩০) তাঁর 'মা নাযালা ফি

আলীয়্যীন মিনাল কোরআন' গ্রন্থে, খাতিব বাগদাদী (মৃত্যু ৪৬৩) তাঁর 'তারিখে বাগদাদ' গ্রন্থে, ইবনে আসাকির দামেশকী (মৃত্যু ৫৭১) তাঁর 'তারিখু মাদিনাতে দামেশক' গ্রন্থে, ইবনে কাছির দামেশকী (মৃত্যু ৭৭৪) তাঁর 'তাফসিরুল কোরআনুল আজিম' গ্রন্থে ও জালাল উদ্দীন সুয়ুতি (মৃত্যু ৯১১) তাঁর 'দুররুল মানসুর' গ্রন্থে দ্বীন পরিপূর্ণতার আয়াতের শানে নযুল হিসাবে যেসব রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন সেখানে বিভিন্ন সূত্রে রাসূল (সা.)-এর সাহাবীদের থেকে, যেমন : আমীরুল মুমিনীন হয়রত আলী (আ.), ইবনে আব্বাস (রা.), আবু সাইদ খুদরী (রা.), জাবের বিন আবদুল্লাহ আনসারী (রা.) ও যায়েদ বিন আরকাম (রা.) থেকে বিশ্বস্ত সনদ সহকারে বিশদ বর্ণনা করেছেন যে, আয়াতটি হযরত আলীর শানে অবতীর্ণ হয়েছে।[১৫]

এ সকল রেওয়ায়াতের একটি হলো আবু সাইদ খুদরী (রা.)-এর বর্ণনা, যেখানে তিনি বলেছেন : 'আল্লাহর নির্দেশ আসার পর রাসূল (সা.) জনগণের সম্মুক্ষে তাঁর অসিয়তে হযরত আলী (আ.)-এর ইমামত সম্পর্কে ঘোষণা দান করেন। সেদিন জনগণ তখনও আলাদা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে নি, এমতাবস্থায় দ্বীন পরিপূর্ণতার আয়াতটি নাযিল হলে, রাসূল (সা.) বলেন :

مِن بَعدِى اَللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى إِكْمَالِ اَلدِّينِ وَ إِتْمَامِ اَلنِّعْمَةِ وَ رِضَا اَلرَّبِّ بِرِسَالَتِي وَ اَلْوَلاَيَةِ لِعَلِيٍّ

'আল্লাহু আকবার! সেই পরোয়ারদিগার যিনি তাঁর নিজের পক্ষ থেকে দ্বীনকে সম্পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর নেয়ামতকে আমাদের জন্য পরিপূর্ণ করেছেন আর আমার রেসালাত ও নবুওয়াতের প্রতি এবং আমার পরে আলী (আ.)-এর বেলায়াতের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।'[১৬]

দ্বীন পরিপূর্ণতার আয়াতের অন্য শানে নযুল ও তার জবাব

আহলে সুন্নাতের বর্ণিত অন্য কিছু রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে যে, এই আয়াত দশম হিজরি সালের আরাফাতের দিন নাযিল হয়েছিল।[১৭]

প্রথম জবাব : এসব রেওয়ায়াতের বেশির ভাগই যায়িফ এবং এগুলোর বিপরীতে গাদীরের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার দিন এ আয়াতের অবতীর্ণের প্রমাণবাহী যে

রেওয়ায়াতগুলো এসেছে সেগুলোকে আহলে সুন্নাতের আলেমরা সহীহ বলেছেন। উপরন্তু, ইমামী ধারার আলেমদের নিকট এ রেওয়ায়াতগুলো মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত।

দ্বিতীয় জবাব : এই দুই ধরনের রেওয়ায়াতগুলোকে সমন্বিত (একত্র করে সিদ্ধান্ত দান) করা যায় এভাবে যে–যেমনটি আহলে সুন্নাতের কিছু খ্যাতনামা আলেম বলে থাকেন–এই আয়াতটি দুই বার নাযিল হয়েছিল।[১৮]

অন্যান্য যে সকল সম্ভবনা কোন কোন লেখকের লেখায় দেখা যায় তাতেও এ সমস্যা রয়েছে যে, তাঁদের উল্লিখিত দাবির সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াতের বৈশিষ্ট্যগুলোর কোন মিল পাওয়া যায় না; এমনকি কিছু কিছু বিষয় এমনও পাওয়া যায় যার সাথে ঐ দিনের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই।[১৯] এরূপ হলে তা কিভাবে যুক্তিসঙ্গত হতে পারে!? কারণ, উক্ত (দ্বীনের পূর্ণতা সম্পর্কিত) আয়াতের আগে ও পরে বিভিন্ন খাদ্যের নিষিদ্ধতার বিষয় বর্ণিত হয়েছে যার সাথে দ্বীনের পূর্ণতা ও কাফেরদের নিরাশ হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। তবে কি বিষয়টা এমন যে, কাফেররা বেশ কিছু খাদ্যের প্রতি অনুরক্ত ছিল আর আরাফার বা গাদীরের দিন যখন ঐ খাবারের নিষিদ্ধতার বিধি-বিধান ঘোষিত হয়েছে তখন তারা নিরাশ হয়ে গেছে!

আয়াতে ব্যবহৃত শব্দাবলির নির্দেশনা : উক্ত আয়াতের শানে নযুল হিসাবে যা কিছু বলা হয়েছে সেগুলো ছাড়াও আয়াতে ব্যবহৃত শব্দাবলি থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এ আয়াতের বর্ণিত বিষয় হলো : ইসলামি সমাজের পরিণত রূপ ও স্থায়িত্বের কাঠামো বর্ণনা করা। এখন আমরা আয়াতে ব্যবহৃত শব্দাবলির প্রতি লক্ষ্য করব-

ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ উল্লিখিত আয়াতে ٱلْيَوْمَ শব্দটি দুইবার ব্যবহার করা হলেও ঘটনাক্রমে ইমামী মাযহাব ও আহলে সুন্নাতের আলেমগণ, উভয়ের জন্য একটিই অর্থ গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ ٱلْيَوْمَ শব্দটি দুইবার আসলেও মূলত তা দ্বারা একটি দিনকেই ইশারা করা হয়েছে এবং উভয় ধারার কোন একজন মুফাসসিরও এ বিষয়ে একাধিক দিনের কথা বলেন নি।[২০]

অপর দিকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটাই যে, এখানে ٱلْيَوْمَ শব্দটির চারটি দিক রয়েছে অর্থাৎ

১. এ দিনে কাফেররা নিরাশ হয়েছিল

২. দ্বীন ইসলাম চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছিল
৩. মানুষের প্রতি আল্লাহ তাঁর নিয়ামত পরিপূর্ণ করেছিলেন
৪. ইসলামকে বিশ্ববাসীর মুক্তির সনদ হিসাবে পরিচয় করিয়েছিলেন।

রাসূল (সা.)-এর ঐতিহাসিক জীবনে এরূপ একটি দিন কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়! সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায়, এটি কোন সাধারণ ও গতানুগতিক দিন ছিল না! এত সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে দিনটিতে সংঘটিত হয়েছে, সে দিনটি যদি একটি সাধারণ দিন হয় তবে তাকে বিশেষ ভাবে উল্লেখের কোন মানে হয় না! এ কারণেই তো কিছু ইয়াহুদি ও নাসারা এ আয়াত নাযিল হওয়ার কথা শুনে বলেছিল যদি এমন আয়াত আমাদের আসমানি গ্রন্থে আসত, তাহলে ঐ দিনকে আমরা ঈদের দিন হিসাবে উদ্‌যাপন করতাম।[২১]

যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি এদিন সংঘটিত হয়েছিল, তা কি খাদ্যবিষয়ক শরীয়াতের হালাল-হারাম সম্পর্কিত কোন বিধান ছিল? এ কথা তো সুস্পষ্ট যে, অনুরূপ আহকামের বিষয় নাযিল হওয়ার ঘটনা নতুন কিছু নয়। কারণ, পূর্বে সূরা বাকারার ১৭৩ নং আয়াত, সূরা আনআমের ১৪৫ নং আয়াত ও সূরা নাহলের ১১৬ নং আয়াতে সার্বিকভাবে তা বর্ণিত হয়েছে। তাই যেমন এক দিক থেকে দ্বীনের হেফাজত ও পূর্ণতার ক্ষেত্রে এরূপ গুরুত্বের দাবি রাখে না; তেমনি অন্য দিক থেকেও তা ওপরে বর্ণিত চারটি বৈশিষ্ট্যের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়! এ আয়াত নাযিল হলে কাফিররা যে আশাহত হয়ে পড়ে, তারই বা কী গুরুত্বপূর্ণ কারণ থাকতে পারে!? যখন রাসূল (সা.)-এর জীবনের স্পর্শকাতর শেষ দিনগুলোতে ইসলামি উম্মাহ রাসূলের অনুপস্থিতির কথা চিন্তা করে বিক্ষিপ্তাবস্থায় পতিত, অন্য দিকে কাফিররা রাসূলের মাধ্যমে সরাসরি ঐশী প্রজ্ঞার নির্দেশনায় চলা অপ্রতিরোধ্য দাওয়াতি কর্মসূচির পরিসমাপ্তির অপেক্ষায় ও তার ফলে ঐশী নেতৃত্বের শূন্যতায় সৃষ্ট ফাঁকা মাঠের সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। কারণ, তারা মনে করত যে, ইসলাম ব্যক্তি রাসূলের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাই তিনি না থাকলে ইসলামও থাকবে না। কারণ, তারা জানত যে, ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্য তাঁরই ন্যায় একজন সুযোগ্য ব্যক্তির নেতৃত্ব সর্বদা অপরিহার্য।

ফলে এটাই স্বাভাবিক যে, রাসূলের ওফাতের পরপরই এরূপ নেতৃত্বের পদ খালি হওয়ার ফলে সবকিছু পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে থাকবে এবং ইসলামের শক্তি

ক্রমান্বয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু যখন রাসূল (সা.) আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.)-কে রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতায় নিজের স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা করেন তখন কাফিররা হতোদ্যম হয়ে পড়ে এবং তাদের প্রত্যাশার ঢেউগুলো মিলিয়ে যেতে থাকে! কেননা, ইসলামের কর্ণধার হিসাবে হযরত আলী (আ.) ও তাঁর বংশের পবিত্র ইমামরা একের পর এক রাসূলের স্থলাভিষিক্ত হবেন। ফলে ইসলাম ইতিহাসের পরিক্রমায় নির্ভুল একদল রক্ষকের হাতে সমর্পিত হয়েছে। ফলে রাসূল (সা.)-এর রেসালাতের সাথে তাঁর ধারাবাহিক স্থলাভিষিক্তের বিষয় অর্থাৎ মুসলমানদের সর্বযুগের নেতৃত্ব এবং ইমামতের ধারা সংযুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে দ্বীন-ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করে, আর এভাবে আল্লাহর দ্বীনের লক্ষ্য বাস্তবায়িত তথা ঐশী হেদায়াত অব্যাহত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হয়। আল্লাহর এ সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে মহানবির অবর্তমানে ইসলামের মধ্যে যে কোন ত্রুটি ও বিচ্যুতির অনুপ্রবেশের সম্ভাবনাকে দূর করে দেয়। এ কাজের মাধ্যমেই দ্বীনের লক্ষ্য অর্জিত ও মুসলিম উম্মাহর প্রতি ঐশী নেয়ামত পূর্ণ হয় এবং ইসলাম আল্লাহর পছন্দনীয় ও মনোনীত দ্বীন হিসাবে ঘোষিত হয়।[২২]

উপরন্তু আয়াতে ٱلَّذِينَ كَفَرُوا বলতে কিয়ামত পর্যন্ত সকল কাফেরের নিরাশ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কারণ, একদিকে আয়াতটি সর্বজনীন হিসাবে বিশেষ কোন গোষ্ঠীর কাফেরকে নির্দেশ করছে না, অন্যদিকে তাতে দ্বীন কিয়ামত পর্যন্ত পূর্ণতা পেয়েছে বলা হয়েছে। সুতরাং ইসলাম কেবল সীমিত কিছুদিন কাফেরদের হাত থেকে নিরাপদ ও বিকৃতিমুক্ত থাকবে না; বরং কিয়ামত পর্যন্ত এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী থাকবে। যে বৈশিষ্ট্যটি শুধু রাসূলের স্থলাভিষিক্ত এক ব্যক্তির মনোনয়নের মাধ্যমে সম্ভব নয়। তাই কিয়ামত পর্যন্ত রাসূলের স্থলাভিষিক্ত ঐশী নেতৃত্বের উপস্থিতি থাকতে হবে। হাদিসে সাকালাইন[২৩] এবং বার নেতা, ইমাম ও খলিফা সম্পর্কিত হাদিস[২৪] এরূপ নেতৃত্ব অব্যাহত থাকার প্রমাণ বহন করছে– যাঁদের মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীন সকল প্রকার বিকৃতি থেকে মুক্ত থাকবে।

দ্বীন পরিপূর্ণতার আয়াত সম্পর্কিত দলিল

আহলে বাইতের ইমামদের (আ.) বক্তব্যে দ্বীন পরিপূর্ণতার আয়াতের দলিল পাওয়া যায়, উদাহরণস্বরূপ সংক্ষেপে এ রকম একটি ঘটনার প্রতি ইশারা করছি।

ইমাম রেযা (আ.)-এর এক বক্তব্যে এসেছে– আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বীনকে পরিপূর্ণ রূপ প্রদান না করা পর্যন্ত তাঁর নবিকে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নেন নি। আল্লাহ কোরআনকে প্রত্যেক বিষয়ের বর্ণনা ও ব্যাখ্যাসহ তাঁর রাসূলের ওপর নাযিল করেন। প্রতিটি হালাল-হারাম বিষয় এবং পুরস্কার ও শাস্তির পরিসীমাগুলোর সাথে মানুষের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার হুকুম-আহকাম সার্বিকভাবে কোরআনে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে বলেছেন :

مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖۚ

'আমরা (এ কোরআনে) কোন কিছু বাকি রাখি নি।' (সূরা আনআম : ৩৮)

রাসূল (সা.)-এর জীবনের শেষ দিনগুলোতে তাঁর সর্বশেষ সফর ছিল বিদায় হজ্বের সফর। এর পরপরই গাদীরে খুম নামক স্থানে আল্লাহর নির্দেশে নিজের স্থলাভিষিক্তকে পরিচয় করিয়ে দেন। এটিই আল্লাহর নাযিল করা সর্বশেষ ফরয ছিল, যা তিনি মানুষের কাছে যথার্থভাবে পৌঁছে দেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসূলের কাছে এভাবে ওহি পাঠান–

ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ

'আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।'

এ আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট মূলত আলী (আ.)-এর ইমামত প্রচার করার সাথে সম্পর্কিত। এর ফলে ফরয নির্দেশগুলো পরিপূর্ণতা পায় এবং এর পরে আর কোন ফরয নির্দেশ নাযিল হয় নি। রাসূলে আকরাম (সা.) দ্বীনের নির্দেশ ও সেগুলো বোঝার পদ্ধতিগুলো পরিষ্কারভাবে তুলে না ধরে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেন নি। উম্মতের প্রয়োজনীয় কোন বিষয় ব্যাখ্যা না করে ছেড়ে দেন নি। অতঃপর সত্যপথ ও তার হাকিকত নির্দিষ্ট করেন এবং হযরত আলী (আ.)-কে সত্যপথের প্রতীক হিসাবে ইমাম নিযুক্ত করেন। এখন যদি কেউ মনে করে যে, আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে পূর্ণতা দেন নি তাহলে স্পষ্টত সে আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ করে নি।[২৫]

প্রশ্ন : কেন কোরআনে গাদীরের সাথে সম্পর্কিত আয়াতগুলো পরস্পর থেকে দূরে রয়েছে এবং তাদের মধ্যে ভিন্ন বিষয়ক অনেক আয়াত অবস্থান করছে? যেমন গাদীর

সম্পর্কিত সূরা মায়েদার প্রথম আয়াত হলো ৩ নং আয়াত ও দ্বিতীয় আয়াত হলো উক্ত সূরার ৬৭ নং আয়াত?

জবাব : প্রথমত, বলা যায় যে, যদি কোরআনের আয়াতগুলো নাযিলের তারিখ অনুসারে সাজানো হতো, তবে এ অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হতো।

দ্বিতীয়ত, হালাল ও হারাম খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে গাদীরের আয়াত থাকার অপর একটি কারণ এটা হতে পারে যে, অত্যন্ত সতর্কতামূলক কৌশলের অংশ হিসাবে এরূপ করা হয়েছে যাতে সঙ্কলনের সময় মুনাফিকরা এ আয়াতগুলোকে বাদ দিয়ে কোরআনে কোনরূপ পরিবর্তন, বিকৃতি ও হ্রাস ঘটাতে না পারে এবং এভাবে ঐশী গ্রন্থকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। তারা যে এরূপ করতে পারত তার প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, রাসূলের জীবনের সর্বশেষ সময়ের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায় যেখানে দেখা যায় যে, রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায় তাঁর উপস্থিতিতেই অসিয়াতনামা লেখার ক্ষেত্রে কতিপয় লোক বাধার সৃষ্টি করে। এমনকি স্বয়ং রাসূল (সা.)-কে প্রলাপ বকার অপবাদ দেওয়া হয়।[২৬] কিছুসংখ্যক লোক রাসূল (সা.)-এর পরবর্তী খলিফা বা স্থলাভিষিক্ত নিয়োগের বিষয়ে বিশেষভাবে স্পর্শকাতর ছিল। এরূপ অবস্থায় ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে খেলাফত সম্পর্কিত সনদ বা দলিলগুলোর সংরক্ষণের জন্য ঐ ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকতে পারে। আর এভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের সাথে মিশে থাকার কারণে কোরআনের ঐ আয়াতগুলোর ভিন্নরূপ ব্যাখ্যার সুযোগ থাকায় কোরআনকে বিরোধীদের সংবেদনশীলতা থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল।[২৭]

অনুবাদ : কামরুল হাসান

সংযোজন ও সম্পাদনা : আবুল কাসেম

তথ্যসূচি

১. সূরা মায়েদা : ৬৭
২. মিনহাজুল কারামাহ ফি মারেফাতিল ইমামাহ, পৃ. ১১৭, আল্লামা আমিনি সেখানে আহলে সুন্নাতের ৩০ জন আলেম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াত গাদীরের ঘোষণার সাথে সম্পর্কিত।
৩. গাদীর ফিল কিতাব ওয়াস সুন্নাত ওয়াল আদাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৩
৪. তাফসিরে আল-মিজান, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪২

৫. প্রাগুক্ত

৬. প্রাগুক্ত, আয়াতে বেলায়াত দার কোরআন, পৃ. ২৮

৭. রাগেব ইসফাহানি এর অর্থ করেছেন 'সংরক্ষণ করা'

৮. তাফসিরে আল-মিজান, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪২

৯. মুনাফিকদের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা এতটাই ছিল যে, পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা, সূরা মায়েদাহ, সূরা আনফাল, সূরা তাওবা, সূরা আনকাবুত, সূরা আহযাব, সূরা হাদীদ, সূরা মুনাফিকীন এবং সূরা হাশরে তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। বিশেষত মহানবির ওপর অবর্তীর্ণ শেষ দুটি সূরায়–সূরা তওবা ও সূরা মায়েদা–মুনাফিকদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যতই রাসূলের মৃত্যু ঘনিয়ে আসছিল এ মুনাফিকদের তৎপরতা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এমনকি তারা মহানবীর প্রাণনাশেরও চেষ্টা করেছিল অর্থাৎ তারা তাঁকে তাবুক যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফেরার পথে হত্যা করতে চেয়েছিল। বারো জন মুনাফিক–যাদের আট জন ছিল কুরাইশ বংশোদ্ভূত এবং বাকি চার জন ছিল মদীনার অধিবাসী–সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, দুই পাহাড়ের মাঝের দুর্গম সরু পথের (গিরিপথ) ওপর থেকে মহানবীর উটকে ভীত-সন্ত্রস্ত্র করে দেবে এবং এভাবে তারা মহানবীকে উপত্যকার গভীরে ফেলে দিতে সক্ষম হবে।– আল ওয়াকিদী প্রণীত আল মাগাযী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৪২-১০৪৩; বিহারুল আনওয়ার, ১১তম খণ্ড, পৃ. ২৪৭ এবং সীরাতে হালাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬২। আর মুনাফিকদের মধ্যকার একটি দল নিজেদের মধ্যে গোপনে বলাবলি করত, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মৃত্যুর সাথে সাথে ইসলামি আন্দোলনেরও পরিসমাপ্তি হবে; আর তখন সবাই প্রশান্তি লাভ করবে। (সূরা তূর : ৩০)-সম্পাদক

১০. পায়ামে কোরআন, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৮৩

১১. তাফসীরে আয়াশী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩১; শাওয়াহেদুত তানযিল লিকাওয়ায়িদুত তানযিল, খ ১, পৃ. ২৫৫; আল কাফি, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৯

১২. উয়ুনু আখবারির রেযা (আ.), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩০

১৩. মাকারেম সিরাজি, আয়াতে বেলায়াত দার কোরআন, পৃ. ৪৯

১৪. আল-মায়েদাহ : ৩

১৫. সদুল গাবাতি ফী মা'রিফাতিস সাহাবা, মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ শাইবানী, বৈরুত, দারুল ইহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮। আল জা'মেয়ু লী আহকামিল কুরআন, বৈরুত, দারুল আহইয়ায়িল তুরাছিল আরাবী, ১৮তম খণ্ড, পৃ. ২৭৮, ১৪০৫ হি.। শাওয়াহেদুত তানযিল, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০১; ইহকাকুল হাক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১০; আয়াতে গাদীর, পৃ-২৪২ ও ২৬৮; ইমামতে আমিরুল মুমিনীন, পৃ-২০৭; বারাহিন ও নুসুসে ইমামাত পৃ-৩১৪; তাশঈদুল-মুরাজায়াত, খণ্ড-২, পৃ-২৬৯। মুসনাদে ইবনে হাম্বাল, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৮২, হা. ১৯৩২১। খাসায়েছু আমিরিল মুমেনীন, পৃ. ১৭৩, হাদিস ৯৩; আল বিদায়া ওয়াল নিহায়া, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১১ এবং ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৭ ও ৩৫০।

১৬. নাহজুল হাক ও কাশফুস সিদ্‌ক, পৃ. ১৯২; দালায়েল আস-সাদুক, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬৪; আল-গাদীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫; আয়াতে বেলায়াত দার কোরআন, পৃ. ৪১।

১৭. দুররুল মানসুর, খণ্ড-২, পৃ-২৫৮

১৮. গাদীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩০; মাআ এমকানিল জামই বে-নুযুলিল আয়াত মাররাতাইন কামা এহতেমালাহু সিবতু ইবনুল জাওযি- অর্থাৎ সিবতে ইবনে জাওযি এ দু বর্ণনার মধ্যে এভাবে সমন্বয়ের কথা বলেছেন যে, তা দু'বার নাযিল হয়েছে।

১৯. বারাহিন ও নুসুসে ইমামত, পৃ. ৩১৯

২০. বাররেসি-এ তাতবিকি তাফসিরে আয়াত ও বেলায়াত দার দিদগহে ফারিকাইন, পৃ. ১৮০।

২১. তাফসিরে তাবারি, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৪; আল-মানার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৫৫।

২২. তাফসিরুল মিজান, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬৮

২৩. মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে 'হুজ্জাতুল বিদা'র 'গাদীরীয়া খুতবা'য় রাসূল (সা.) থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন : 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি ভারী বস্তু রেখে যাচ্ছি, যার প্রথমটি হলো আল্লাহর কিতাব... এবং আমার আহলে বাইত।' অতঃপর 'আমি আমার আহলে বাইতের কথা তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি' বাক্যটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন।– মুসলিম, সহীহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৭, হাদিস ২৪০৮ এবং ইবনে হাম্বাল, আহমাদ, মুসনাদ, ৩২ তম খণ্ড, পৃ. ১০, হাদিস ১৯২৮; ইবনে শাহরে অশুব, মানাকিব, পৃ. ২২৬, হাদিস ২৮৪; আহমাদ ইবনে শুয়াইব নাসায়ী হাদিসটি 'হুজ্জাতুল বিদার পর গাদীরের খুতবা'য় এভাবে বর্ণনা করেছেন : 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মাঝে দু'টি ভারী বস্তু রেখে গিয়েছি, তার একটি অপরটি হতে বড়, আল্লাহর কিতাব এবং আমার বংশধর ও আহলে বাইত; এ দু'টির প্রতি কীরূপ আচরণ করবে তার প্রতি লক্ষ্য রেখ, যেহেতু এ দু'টি হাউযে কাওসারে আমার সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।'

(নাসায়ী, আহমাদ, খাসায়িস, পৃ. ১১২, হাদিস ৭৮; ইবনে মাগাযিলী, মানাকিব, পৃ. ২৩০, হাদিস ২৮৩; আবু ইয়ালা, মুসনাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৭, হাদিস ১০২১; ইবনে আবি আসিম, কিতাবুস সুন্নাহ, পৃ. ৬৩০, হাদিস ১৫৫৫; ইবনে হাম্বাল, মুসনাদ, ১৭ তম খণ্ড, পৃ. ২১১, হাদিস ১১১৩১; তাবরানী, সুলাইমান, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬৯, হাদিস ৯৮০ ও ৪৯৮১। তিরমিযী, মুহাম্মাদ, সুনানে তিরমিযী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬২২, হাদিস নং ৩৭৮৬ ও পৃ. ৬৬৩, হাদিস নং ৩৭৮৮; হাকিম নিশাবুরী, মুসতাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৯ ও ১১০; ইবনে আসিম, কিতাবুস সুন্নাহ, পৃ. ৬২৯, হাদিস ১৫৫৩ এবং পৃ. ৬৩০, হাদিস ১৫৫৮; ইবনে হাম্বাল, মুসনাদ, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ১৬১, হাদিস ১১১০৪; তাবরানী, সুলাইমান, আল মু'জামুল কাবির, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৫-৬৭, হাদিস ২৬৭৮, ২৬৮০ ও ২৬৮১ এবং ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬৬, হাদিস ৪৯৭১; ইবনে হামিদ, মুসনাদ, পৃ. ১০৭-১০৮, হাদিস ২৪০; 'কিতাবুল্লাহ ওয়া আহলুল বাইত ফি হাদিসিস সাকালাইন মিন মাসাদিরি আহলিস সুন্নাহ' গ্রন্থে এই হাদিসটির সূত্রসমূহ মোটামুটিভাবে আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

২৪. انَّ هذا الامر لا ينقضى حتى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة - তাদের মধ্যে বারজন খলিফা না আসা পর্যন্ত এ বিষয়টি (ইসলাম ও নবুওয়াতের মিশন) শেষ হবে না। (ফাতহুল বারি

ফি শারহি সাহিহ বুখারী, ইবনে হাজার আসকালানী, ১৩তম খণ্ড, পৃ. ২১২, গবেষণা : মোহিব উদ্দিন আল-খাতিব, প্রকাশক : দারুল মারেফা, বৈরুত। সুয়ুতি, জালাল উদ্দীন আবুল ফাজল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (মৃত্যু ৯১১ হি.), তারিখুল খালিফা, ১ম খণ্ড, পৃ ১০, গবেষণা : মুহাম্মাদ মহিউদ্দিন আবদুল হামিদ, প্রকাশক : মাতবায়াতুস-সাআদাহ, মিশর, সংস্করণ : প্রথম ১৩৭১ হি.; নিশাবূরী আল-কুশাইরী, আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (মৃত্যু ২৬১ হি.), সহীহ মুসলিম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫২, হাদিস ১৮২১, পৃ. ১৪৫৩, হাদিস ১৮২২, গবেষণা : মোহাম্মদ ফুয়াদ আবদেল বাকী, প্রকাশক : দারে এহিয়াইউত তুরাছিল আরাবী, বৈরুত। সাজেস্তানি আল-আজদি, আবু-দাউদ সুলায়মান ইবনুল আসআস (মৃত্যু ২৭৫ হি.), সুনান আবু দাউদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১০৬, হাদিস নং ৪২৮০, গবেষণা : মুহাম্মাদ মহিউদ্দিন আবদুল হামিদ, প্রকাশক : দারুল ফির্ক। এ হাদিসটি মহান আলেমে দ্বীন হাম্বলী মাযহাবের প্রধান আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থের ৮৬ পৃষ্ঠা থেকে ১০৭ পৃষ্ঠায় এবং হাকেম নিশাবুরী তাঁর মুসতাদারাকের ৩য় খণ্ডের ৭১৫-৭১৬ নং পৃষ্ঠায়, হাদিস নং ৬৫৮৬ ও ৬৫৮৯ সহ অন্যরাও নিয়ে এসেছেন। সনদের দিক থেকে এই হাদিসের মান হাসান।

আসকালানি আশ-শাফেয়ী, আহমেদ বিন আলী বিন হাজর আবুল ফাজল (মৃত্যু ৮৫২ হি.), ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৭, মাতালেব আল-আলিয়াহ বেযাওয়ায়িদিল-মাসানিদ আস-সামানিয়া, গবেষণা : ড: সাদ বিন নাসের বিন আবদুল আজিজ আশ-শাতরি, প্রকাশক : দারুল আসমাহ দারুল গাইয়াস, প্রথম সংস্করণ, সৌদি আরব, ১৪১৯ হি.।

২৫. মাআনিল আখবার, পৃ. ৯৬; আল কাফি, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৯।

২৬. সাহিহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭ ও ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৩৮, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৬১; মুসনাদে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৫।

২৭. তাফসিরে নেমুনে, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭০; মিনহাজুল কারামাত ফি মারেফাতিল ইমামাহ, পৃ. ১১৮, আয়াতুল গাদীর, পৃ. ২৮৬, পায়ামে কোরআন, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৮৬।

আহলে বাইতের অনুসারীদের সম্পর্কে আহলে সুন্নাতের নিরপেক্ষ আলেমদের অভিমত

আহমাদ খমেইয়ার

মূল প্রবন্ধ : আহলে বাইতের অনুসারীদের সম্পর্কে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের নিরপেক্ষ আলেমদের অভিমত মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্য স্থাপনের পথে কার্যকর ও সময়োপযোগী ভূমিকা পালন করেছে। এসব বিশিষ্ট সুন্নি আলেমের দৃষ্টিতে ওয়াহাবি এবং আহলে বাইতের বিদ্বেষীরা বার ইমামী শিয়া এবং নুসাইরীদের (অতিরঞ্জিত ধারণা পোষণকারী) মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে জানে না; এ কারণে তারা আহলে বাইতের অনুসারীদের মতাদর্শ এবং তাদের মৌলিক বিশ্বাস সম্পর্কে পরিচিতির ক্ষেত্রে ভুল করে থাকে। এর ফলে তারা তাদেরকে মিথ্যা অপবাদ দেয়। এখানে আমরা এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ কিছুসংখ্যক সুন্নি লেখক ও চিন্তাবিদের মতের প্রতি ইশারা করব :

১. মিশরের সুন্নি চিন্তাবিদ আনওয়ার জুনদী এ সম্পর্কে লিখেছেন, 'সত্য এই যে, একজন গবেষকের উচিত অনেক সতর্কতার সাথে মন্তব্য করা এবং আহলে বাইতের অনুসারী ও নুসাইরী (গালী ও অতিরঞ্জিত ধারণা পোষণকারী) সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য করা। আহলে বাইতের ইমামরা গালীদের প্রতি কঠিন ভাষায় আক্রমণ করেছেন এবং তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন।' (এ দুই শ্রেণির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে)।

২. অপর মিশরীয় লেখক আলী আবদুল ওয়াহেদ ওয়াফী এ সম্পর্কে লিখেছেন, 'আমাদের অনেক লেখক জাফরী শিয়া (বার ইমামপন্থী শিয়া) এবং অন্য ফেরকার শিয়াদের সাথে সংমিশ্রণ করেছেন।'

৩. সমসাময়িক প্রসিদ্ধ মিশরীয় আলেমদের একজন হলেন মুহাম্মাদ গাজ্জালী। তিনি আহলে বাইতের অনুসারীদের অন্ধ বিরোধীদের প্রতি সঠিক পর্যালোচনার আহ্বান জানিয়েছেন এবং এক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতির সংশোধনের জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন।

তিনি শক্ত হাতে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। তাদের মধ্যে যারা শিয়াদের সাথে নুসাইরীদের পার্থক্য করে নি তিনি তাদের ভুল ভঙ্গানোর চেষ্টা করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'কোন কোন মিথ্যাবাদী শিয়াদের সাথে নুসাইরীদের এক করে দেখেছে। তারা গুজব ছড়িয়েছে যে, শিয়ারা আলী (আ.)-এর অনুসারী এবং সুন্নিরা রাসূল (সা.)-এর অনুসারী। শিয়ারা নবুওয়াতের জন্য আলী (আ.)-কে রাসূল (সা.)-এর থেকে অধিকতর যোগ্য মনে করে এবং ভুল করে তা রাসূল (সা.)-কে দেয়া হয়েছে। এটি নিকৃষ্ট এক মিথ্যা অপবাদ।'

আরেক জায়গায় মুহাম্মাদ গাজ্জালী বলেছেন, 'কোন কোন ব্যক্তি শিয়াদের মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বলেছে, কোরআনের আয়াতে ঘাটতি রয়েছে।'

৪. সুন্নি মনীষী আবদুল হালিম জুনদি লিখেছেন, 'নুসাইরীদের কর্মকে শিয়াদের ওপর আরোপ করা হয়েছে। এ কারণে শিয়াদের সম্পর্কে অন্যদের মনে খারাপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে ও নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তাদেরকে ঐ সকল মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে যেগুলো থেকে তারা নিজেদেরকে দূরে রাখে। এ সকল মিথ্যা অপবাদের একটি হল আল্লাহ ইমামদের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছেন অথবা ইমাম স্বয়ং আল্লাহ; অথচ তা বাড়াবাড়ি পর্যায়ের বাতিল এক বিশ্বাস, যা কাফের পর্যায়ে পৌঁছায়।'

৫. ড. ত্বাহা হুসাইন এ বিষয়ে বলেছেন, 'শিয়াদের দুশমনরা শিয়াদের সম্পর্কে যা কিছু জানে এবং যা কিছু জানে না সবকিছুর সাথে সম্পর্কিত করে। শিয়াদের দুশমনরা তাদের সম্পর্কে যা কিছু শোনে এবং যা কিছু দেখে তা যথেষ্ট মনে করে না; বরং তারা শিয়াদের সম্পর্কে যা কিছু বলা এবং শোনা হয়, তার চেয়েও অধিক বলে। তারা এ পর্যন্তই থেমে থাকে না; বরং এগুলোর সবকিছুই আহলে বাইতের অনুসারীদের ঘাড়ে চাপায়। তারা (শিয়াদের দুশমনরা) আঁড়ি পেতে বসে থাকে যে, শিয়ারা কী বলে এবং কী করে। অতঃপর শিয়ারা যা কিছু বলে ও করে এর মধ্যে তারা সংযোজন করে এবং আজগুবি ও আশ্চর্যজনক কথা ও কর্ম দ্বারা তাদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়।

৬. শিয়াদের নিকট প্রচলিত কোরআনের বাইরে আলাদা কোরআন থাকার অভিযোগের জবাবে সালিম বেহনাসাবী বলেন, 'সুন্নিদের মাঝে যে কোরআন প্রচলিত রয়েছে, শিয়াদের ঘরে এবং মসজিদে একই কোরআন রয়েছে।'

৭. মিশরের ইসলামি আন্দোলনের প্রসিদ্ধ নেতা এবং মনীষী হাসানুল বান্না শিয়াদের বিষয়ে ওয়াহাবিদের ভুল ও বিভ্রান্তিকর পরিচিতি সংশোধন করার অনেক চেষ্টা করেছেন। তিনি যারা শিয়াদেরকে নুসাইরীদের গোত্রে ফেলেন, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। তিনি দুনিয়ার গ্রন্থাগারগুলোতে শিয়া মনীষীদের বইতে ভরা থাকার পরও শিয়াদের সাথে নুসাইরীদের গুলিয়ে ফেলার বিষয়টিতে আশ্চর্য হয়েছেন।

৮. মিশরের বিখ্যাত লেখক আব্বাস মাহমুদ আক্কাদের মতো ব্যক্তিরা এ ধরনের বিচ্যুতির বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন। এ কারণে মিশরের বিখ্যাত লেখক আনিস মানসুর তাঁর থেকে বর্ণনা করেন, 'আব্বাস মাহমুদ আক্কাদ মৃত্যুর পুর্বে শিয়া মাহযাব সম্পর্কে যুক্তিযুক্ত গবেষণা করে গ্রন্থ রচনা করতে চেয়েছিলেন; কারণ, শিয়াদের ওপর বিভিন্ন সময়ে যে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছিল তার ফলে মানুষের মাঝে শিয়াদের সম্পর্কে খারাপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের গ্রন্থ রচনা করার সুযোগ তাঁর হয় নি।'

৯. যারা শিয়া এবং নুসাইরীদের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না তাদের কঠিন সমালোচনা করে সুন্নি ইতিহাসবিদ মুহাম্মাদ কুরদ আলী বলেছেন, 'কোন কোন লেখক যাঁরা মনে করেন শিয়া মাযহাব আবদুল্লাহ বিন সাবার বেদআতের মাধ্যমে উৎপত্তি ঘটেছে, তাঁরা বাতিল কল্পনা করেছেন এবং তা তাঁদের স্বল্প গবেষণা ও পর্যালোচনার ফসল। যে কেউ এই ব্যক্তি (আবদুল্লাহ বিন সাবা) সম্পর্কে শিয়ারা কীরূপ ধারণা পোষণ করে তা জানে অর্থাৎ তার কথা ও আচরণ শিয়া সমাজ ও আলেমদের নিকট অত্যন্ত মন্দ ও ঘৃণ্য হওয়া এবং তার সাথে তাদের সম্পর্কহীনতার ঘোষণার বিষয়টি জানে, তাহলে সে অনুধাবন করতে পারবে যে, নুসাইরীদের সাথে শিয়াদেরকে সম্পর্কিত করা বড় ধরনের ভুল।

১০. ইখওয়ানুল মুসলিমীনের অন্যতম নেতা উমর তিলমিসানী, শিয়া ও নুসাইরীদের এক মনে করায় আশ্চর্যবোধ করে বলেছেন, 'শিয়াদের ফিকাহশাস্ত্রের উন্নত চিন্তা ও গভীরতার দিকটি ইসলামি জগৎকে (আইনশাস্ত্রকে) অভাবহীন করেছে।'

১১. যে সকল ওয়াহাবি শিয়া এবং নুসাইরীদের একই মনে করে তাদের জবাবে শেইখ মুহাম্মাদ আবু যুহরা বলেন, 'ইমামীয়ারা তাদের ইমামদের মর্যাদাকে রাসূল (সা.)-এর মর্যাদার পর্যায়ে নিয়ে যায় না।'

একইভাবে তিনি লিখেছেন, 'শিয়ারা ইসলামি মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন সন্দেহ নেই...। তারা যা কিছু বলে কোরআন এবং রাসূল (সা.)-এর হাদিসের সূত্রেই বলে। তারা তাদের সুন্নি প্রতিবেশীদের বন্ধু এবং একে অপরের প্রতি ঘণনা পোষণ করে না।'[১২]

১২. শেইখ শালতুত এবং মুহাম্মাদ আবু যুহরার শিক্ষক আহমাদ বেগ এ সম্পর্কে বলেন, 'ইমামীয়া শিয়ারা সকলেই মুসলমান এবং কোরআন, রাসূল (সা.) ও যা কিছু রাসূল (সা.) এনেছেন, তার প্রতি ঈমান রাখে। তাদের মধ্য হতে ইসলামের প্রথমের দিকে এবং বর্তমান সময়ে বড় ফকিহ এবং অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানী ব্যক্তির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়; যারা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে গভীর ও ব্যাপক জ্ঞানী ছিলেন। তাঁদের রচিত গ্রন্থ সংখ্যার দিকে থেকে কয়েক লক্ষে পৌঁছবে। এগুলোর বড় এক অংশ সম্পর্কে আমি জানতে পেরেছি।'

১৩. জর্ডানের মুফতি মাহমুদ সারত্বাবী বলেন, 'আমার সৎকর্মশীল পূর্বপুরুষরা শিয়াদের সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন আমিও তাই বলতে চাই। তাঁরা বলেছেন, ইমামীয়া শিয়ারা আমাদের দ্বীনি ভাই। তারা আমাদের ওপর ভ্রাতৃত্বের অধিকার রাখে। আমরাও তাদের ওপর ভ্রাতৃত্বের অধিকার রাখি।'

১৪. উস্তাদ আবদুল ফাত্তাহ আবদুল মাকসুদ বলেন, 'আমার দৃষ্টিতে শিয়া মাযহাবই ইসলামের সঠিক রূপের সম্মুখীন হয়েছে এবং ইসলামের পরিষ্কার আয়না। যে ব্যক্তি ইসলামকে দেখতে চায় সে যেন প্রকৃত শিয়াদের বিশ্বাস এবং আমলের দিকে তাকায়। ইসলামি বিশ্বাস রক্ষা করার জন্য প্রতিরোধের ময়দানে শিয়ারা যে পরিমাণ অবদান রেখেছে, তার জন্য ইতিহাসই উত্তম সাক্ষী।'

১৫. মিশরের রাজধানী কায়রোর ভাষা অনুষদের শিক্ষক ড. হামিদ হানাফী দাউদের মতে, 'এখান থেকে চিন্তাশীল পর্যালোচকের জন্য এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে পারব। আর তা হলো বক্র চিন্তার অধিকারী ও মূর্খরা যেরূপ ধারণা করে যে, শিয়া মাযহাব যুক্তিহীন দলিল, কুসংস্কার ও অমূলক কল্পনা ও জাল হাদিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত অথবা শিয়া মাযহাব আবদুল্লাহ ইবনে সাবা বা অন্য কোন ঐতিহাসিক কাল্পনিক ব্যক্তির সৃষ্টি। কিন্তু এ মাযহাব এ ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা যেভাবে শিয়াদের সম্পর্কে চিন্তা করেছে আমরা এর বিপরীত মনে করি। আধুনিক জ্ঞানগত পদ্ধতির ক্ষেত্রে শিয়ারা বর্ণনামূলক (কোরআন ও সুন্নাহ) এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উভয় বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ

করে থাকে এবং তারাই ইসলামি মাযহাবসমূহের মধ্যে প্রথম এ পথকে নির্বাচন করেছে। এভাবে তারা এমন এক ময়দানে পৌঁছেছে যার সীমা অনেক প্রসারিত। যদি শিয়ারা জ্ঞানের এ দুটি ধারার অর্থাৎ বর্ণনা ও বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে সমন্বয় করার ক্ষমতা অর্জন না করত তাহলে তারা কখনই গভীর গবেষণাধর্মী ইজতেহাদে পৌঁছতে পারত না এবং ইসলামি শরীয়তের মূলকে অপরিবর্তিত রেখে, যুগ এবং স্থানের সাথে নিজেদেরকে খাপ খাওয়াতে পারত না।

তিনি একইভাবে সাইয়্যেদ মুরতাজা আসকারীর গ্রন্থ 'আবদুল্লাহ বিন সাবা'-র প্রশংসা করে বলেছেন, 'ইসলামের ইতিহাসের তেরশ' শতাব্দী পেরিয়ে গেল। আমরা শিয়া বিরোধী আলেমদের পক্ষ থেকে দেওয়া ফতোয়া লক্ষ্য করছি; যে ফতোয়াগুলো আবেগ ও কামনা-বাসনা দ্বারা মিশ্রিত। এ অপছন্দনীয় পদ্ধতিটি ইসলামি মাযহাবগুলোর মাঝে ব্যাপক ফাটলের কারণ হয়েছে। এর ফলে এ মাযহাবের মনীষীদের জ্ঞান থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। প্রকৃতপক্ষে আমাদের এ ধরনের কুসংস্কারের কারণে শিয়া মাযহাবের যে পরিমাণ ক্ষতি না হয়েছে; তাদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন না করার কারণে এর চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে ক্ষতির সম্মুখীন আমরা হয়েছি। বাস্তবে এ সকল কুসংস্কার থেকে শিয়ারা মুক্ত।'

'যদি এ শ্রেণির আলেমরা নিজেদেরকে কুসংস্কার থেকে দূরে রাখত এবং তাদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করত, তাদের কাছ থেকে সঠিক জ্ঞানগত পদ্ধতি গ্রহণ করত এবং তাদের মনের কামনা-বাসনার চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তিকে অগ্রাধিকার দিত, তাহলে শিয়াদের নিকট থেকে অনেক জ্ঞান উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের কাছে পৌঁছত। আমরা এ থেকে অনেক উপকৃত হতে পারতাম।'

'যেভাবে জ্ঞানের ক্ষেত্রে একজন নিরপেক্ষ গবেষক শিয়া মাযহাব থেকে উপকৃত হয় সেভাবে অন্যান্য মাহযাবের আলেমদের থেকে তারা উপকৃত হয়। যদি নিরপেক্ষ গবেষক হতে হয় তবে সুন্নি চার মাযহাব সম্পর্কে জানার পাশাপাশি শিয়া ফিকাহশাস্ত্র থেকেও জ্ঞান অর্জন করা জরুরি।'

'তাদের সঠিকতার বিষয়টি প্রমাণের ক্ষেত্রে আমাদের জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, শিয়া মাযহাবের পতাকাবাহক ইমাম জাফর সাদিক (আ.) আহলে সুন্নাতের দুজন ইমামের শিক্ষক। এদের মধ্যে একজন হলেন আবু হানিফা নুমান বিন ছাবিত (মৃত্যু ১৫০ হিজরি) এবং অপরজন আবু আবদুল্লাহ মালিক বিন আনাস (মৃত্যু ১৭৯ হিজরি)। এ

কারণেই আবু হানিফা বলতেন : 'যদি ঐ (ইমাম জাফর সাদিকের সান্নিধ্যের) দুই বছর না থাকত, তাহলে নুমান ধ্বংস হয়ে যেত।' যে দুই বছর আবু হানিফা ইমাম জাফর বিন মুহাম্মাদ (আ.) থেকে অনেক জ্ঞান অর্জন করেছেন। আনাস বিন মালিক বলেছেন, 'জাফর বিন মুহাম্মাদের মতো জ্ঞানী ফকিহ আমি দেখি নি।'"

১৬. আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামি দর্শনের প্রফেসর আবুল ওফা গানীমী তাফতাযানী বলেন, 'পশ্চিমা ও প্রাচ্যের ইসলামি চিন্তাবিদরা ইসলামের শুরুতে এবং বর্তমান সময়ে শিয়াদের বিষয়ে ভুল সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। যে সিদ্ধান্তগুলোর পেছনে কোন দলিল ও বর্ণনামূলক সাক্ষ্য নেই। সাধারণ মানুষরাও এ ভুল মতগুলোর সত্যতা যাচাই-বাছাই না করেই একে অপরের নিকট পৌঁছে দিয়েছে এবং তার ভিত্তিতে শিয়াদেরকে এসকল ভুল মতে বিশ্বাসী বলে অভিযুক্ত করেছে। শিয়াদের মূল গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা এর অন্যতম কারণ। এ সকল অভিযোগের ক্ষেত্রে তারা শিয়াদের দুশমনদের গ্রন্থগুলোকে সূত্র হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।'

১৭. যখন ড. তিজানী শিয়াদের সম্পর্কে জানতে শুরু করেছিলেন তখন একদল চরমপন্থী তাঁকে বলেছিল, শিয়ারা আলীর ইবাদত করে, তারা বিশ্বাস করে জিবরাইল (আ.) ওহী পৌঁছাতে ভুল করেছেন। শিয়ারা তাদের মতবাদের মাধ্যমে ইসলামকে ধ্বংসের চেষ্টা করছে। আমাদের কোরআনের ব্যতিক্রম আরেকটি কোরআন তাদের রয়েছে। তারা ইসলাম সম্পর্কে বিদ্বেষ পোষণ করে। তাদের বিবাহ জিনার অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া আরো অনেক সংশয় উপস্থাপন করে থাকে; বরং এমন অনেক অপবাদ রয়েছে যেগুলোর সত্যতা সম্পর্কে সুন্নি যুবকদের সন্দেহ আরো বৃদ্ধি পায়। যখন সুন্নি যুবকরা সত্যকে আবিষ্কার করে তখন তাদের মাযহাবের গবেষক এবং আলেমদের প্রতি তাদের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়। আর তখন এ সকল যুবকের মধ্যে চিন্তাগত পরিবর্তন এবং সকল সুন্নি মাযহাবের জ্ঞানের শাখাসমূহে সন্দেহ ও সংশয় ছাড়া আমরা আর কিছু আশা করতে পারি না।...

ড. তিজানীর শিয়া মাযহাব সম্পর্কে জানার আগ্রহের আরেকটি কারণ হলো একদল ব্যক্তির মধ্যে সাহাবাদের ইজতিহাদের দাবির ক্ষেত্রে চরম বাড়াবাড়ি; কারণ, আমরা দেখতে পাই কীভাবে মুয়াবিয়া ইজতিহাদের বিষয়কে ঠাট্টা-উপহাস করেছেন। তিনি রাসূল (সা.)-এর সাহাবী হুজর বিন আদীকে হত্যা করেছেন এবং আলী (আ.)-কে মিম্বরে বসে লানত দেওয়ার প্রথা চালু করেছেন এবং যিয়াদ বিন আবিহকে রাসূল

(সা.)-এর হাদিসের বিরোধিতা করে নিজের পিতার সন্তান হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদ হিসেবে এ সব কাজের বৈধতা দান করেছেন। ওয়াহাবিদের পক্ষ থেকে বলা হয়, ইয়াযীদ ইমাম হুসাইন (আ.)-কে হত্যা করতে এবং এর পর মদিনার বিদ্রোহ দমনের ক্ষেত্রে হত্যাযজ্ঞ চালানোর ক্ষেত্রে বাধ্য ছিল এবং এ কারণে তাকে পুরস্কৃত করা হবে।

বাস্তবে বিষয়টা হলো এই যে, এ ধরনের চিন্তা আহলে সুন্নাহর পূর্ববর্তী মনীষীদের মত নয়; বরং হয় এগুলো শিয়াবিদ্বেষী নাসেবীদের মত যারা আহলে সুন্নাত নাম ধারণ (নিজেদের সুন্নি বলে দাবি) করেছে অথবা তারা ঐ শ্রেণিভুক্ত যারা শিয়াদের মধ্যকার অতিরঞ্জিত বিশ্বাস পোষণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখাতে গিয়ে এমন করেছে।

তথ্যসূত্র

১. আলইসলাম ওয়া হারকাতুত তারিখ, আনওয়ারুল জুনদী, পৃ. ৪২১।
২. বাইনাশ শিয়া ওয়া আহলিস সুন্নাহ, আলী আবদুল ওয়াহেদ ওয়াফী, পৃ. ১১।
৩. রিসালাতুত তাকরীব, ৩য় সংখ্যা, প্রথম বছর, শাবান ১৪১৪ হিজরি, পৃ. ২৫০।
৪. লাইসা মিনাল ইসলাম, মুহাম্মাদ গাজ্জালী, পৃ. ৪৮।
৫. আল-ইমাম জাফর সাদিক (আ.), আবদুল হালীম আল জুনদী, কায়রো, আল-মাজলিসুল আ'লা
৬. লিশশুয়ুনুল ইসলামীয়া, ১৯৭৭ খ্রি. পৃ. ২৩৫।
৭. আলী ওয়া বানুহু, ত্বাহা হুসাইন, পৃ. ২৫।
৮. আল-সুন্নাতুল মুফতারা আলাইহা, সালিম বেহনাসাবী, পৃ. ৬।
৯. জাকারিয়াত লা মুজাক্কেরাত, ওমার তিলমিসানী, পৃ. ২৫০।
১০. লায়াল্লাকা তাদ্বহাকা, আনিস মানসুর, পৃ. ২০১।
১১. খুতাতুশ-শাম, মুহাম্মাদ করদ আলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৫১।
১২. আলমাজাল্লাতুল আলামিল ইসলামী, সংখ্যা ৯১।
১৩. আল ইমাম আসসাদিক, আবু যুহরা, পৃ. ১৫১।
১৪. তারিখুল মাযাহিবিল ইসলামীয়া, মুহাম্মাদ আবু যুহরা, পৃ. ৩৯।
১৫. আহমাদ বেগ, তারিখুত তাশরিয়ীল ইসলামী।
১৬. মাজাল্লাতু রেসালাতাছ-ছাকালাইন, ২য় সংখ্যা, প্রথম বছর, ১৪১৩ হিজরি, পৃ. ২৫২।
১৭. ফী সাবিলিল ওয়াহদাতিল ইসলামীয়া, সাইয়্যেদ মুরতাজা রাজাভী, পৃ. ২০০।

১৮. নাজারাত ফীল কুতুবিল খালিদাহ, হামিদ হানাফী দাউদ, কাহেরা, মাকতাবুন নাজাহ, পৃ. ৩৩।

১৯. আবদুল্লাহ বিন সাবা, সাইয়্যেদ মুরতাজা আসকারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩।

২০. মাআ' রিজালিল ফিক্‌র ফিল কাহিরাহ, সাইয়্যেদ মুরতাজা রাজাভী, পৃ. ৪০। কারায়াতু ফীত তাহাব্বুলাতুস সুন্নীয়াতি লিশ-শিয়াতি, হাসান বিন ফারাহানে মালেকী।

২১. মুয়াবিয়া, যিয়াদ বিন আবিহকে নিজের পক্ষে আনার জন্য তাকে ভাই হিসেবে সম্বোধন করেছেন। কারণ, তার মা সুমাইয়ার সাথে আবু সুফিয়ানের অবৈধ সম্পর্কের মাধ্যমে সে জন্ম লাভ করেছে। এ দাবির মাধ্যমে তিনি রাসূল (সা.)-এর হাদিসের বিরোধিতা করেছেন। হাদিসে এসেছে সন্তান শরিয়তের বৈধ সম্পর্কের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়; জিনা ও ব্যভিচারের মাধ্যমে কেবল শরিয়তের হাদ (শাস্তি) কপালে জোটে।

২২. আলকিরাআতু ফিত তাহাভভুলাতিস সুন্নিয়াহ লিশশিয়া, হাসান বিন ফারহান আলমালিকী।

অনুবাদ : মো. রফিকুল ইসলাম

জিহাদ ও হিজরত

সংকলন : মিকদাদ আহমেদ

জিহাদ ইসলাম অন্যতম ভিত্তি। জিহাদকারীর মর্যাদা জান্নাতের সর্বোচ্চ পর্যায়ে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সারা জীবন জিহাদ করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে জিহাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

মক্কা জীবনে মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

فَلَا تُطِعِ ٱلْكَـٰفِرِينَ وَجَـٰهِدْهُم بِهِۦ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾

'(হে নবী!) আপনি কখনোই কাফিরদের আনুগত্য করবেন না; বরং তাদের বিরুদ্ধে এ কোরআনের সাহায্যে বিরাট ধরনের জিহাদ করুন।'– সূরা ফুরকান : ৫২

মক্কায় অবতীর্ণ এ আয়াতে কাফিরদের বিরুদ্ধে যে জিহাদের আদেশ দেয়া হয়েছিল তা তরবারি দিয়ে জিহাদ নয়; বরং তা হচ্ছে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ, বর্ণনা এবং নীতি-আদর্শের দ্বারা জিহাদ।

সত্যবিরোধীদের সামনে সত্য কথা বলা, ইসলামের দুশমনদের সামনে ইসলামের বিশেষত্ব তুলে ধরা এবং তাদের তৈরি হাজারো প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আল্লাহর দিকে অবিচলভাবে দাওয়াত দিতে থাকাই ছিল সেই জিহাদ।

পবিত্র কোরআনে আমরা চার ধরনের জিহাদের বিষয় দেখতে পাই :

১. নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদ
২. শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ
৩. মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ
৪. কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ

১. নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদ

মানুষের মধ্যে নাফ্স নামের এক বিরাট শক্তির অস্তিত্ব রয়েছে। ব্যক্তির সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে এ নাফ্সকে একান্তভাবে আল্লাহর অনুগত বানানো। কেননা, এ শক্তিটি আল্লাহর অনুগত না হলে কারো পক্ষে আল্লাহর দীন ইসলামকে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

মহান আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ দৈহিক সত্তা দান করেছেন। একই সাথে তিনি মানুষকে একটি সুস্থ প্রকৃতিও দিয়েছেন। সে প্রকৃতিকে ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য ও ন্যায়-অন্যায় জ্ঞানসম্পন্ন করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআন এ বিষয়ে বলা হয়েছে :

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّىٰهَا ﴿٧﴾

'মানবপ্রকৃতি এবং সেই সত্তার শপথ, যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন।'– সূরা শাম্স : ১১

এ নাফ্সের একটি রূপ হচ্ছে তা মানুষকে মন্দ কাজে প্ররোচিত করে, অন্যায় ও পাপ কাজ করতে আদেশ করে।

পবিত্র কোরআনের সূরা ইউসুফের ৫৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

۞ وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِىٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىٓ ۚ إِنَّ رَبِّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٣﴾

'এবং আমি আমার প্রবৃত্তিকে নিষ্কলঙ্ক বলছি না, (কেননা,) নিশ্চয় প্রবৃত্তি মন্দ কর্মের আদেশ প্রদানে অত্যন্ত তৎপর; তবে তা ব্যতীত যার প্রতি আমার প্রতিপালক করুণা করেন; নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অতিশয় ক্ষমাশীল, অনন্ত করুণাময়।'

মানুষের মন্দ কাজে প্রবৃত্ত হওয়া এ নাফ্সে আম্মারার কারণেই হয়।

একারণে তার পাশাপাশি আরো দুটি প্রবণতা মানুষের মধ্যে রয়েছে। এর একটি হচ্ছে নাফ্সে লাওয়ামা অর্থাৎ তিরস্কার ও ভর্ৎসনাকারী মানসিকতা। মানুষ যখন নাফ্সে

আম্মারার কারণে কোন পাপ কাজ করে ফেলে তখন নাফ্সে লাওয়ামা তাকে অনুতাপে দগ্ধ করে। নাফ্সে লাওয়ামা তাকে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করে।

যে ব্যক্তি নাফ্সে আম্মারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নাফ্সকে আল্লাহর অনুগত বানাবে সে একজন মুজাহিদ।

মহানবী (সা.) বলেছেন :

المجاهدُ مَنْ جاهَدَ نَفْسَهُ فِي طاعَةِ اللهِ

'যে ব্যক্তি স্বীয় নাফ্সকে আল্লাহর অনুগত বানাবার লক্ষে জিহাদ করল, সে একজন প্রকৃত মুজাহিদ।'– মুসনাদে আহমদ, ইবনে হাব্বান, হাকেম

নাফ্সে আম্মারার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যদি কেউ তাকে নিজের অধীন করতে না পারে তাহলে সে-ই তাকে অধীন করে নেবে।

মানুষকে তাই তার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি জিহাদ করে যেতে হবে। নাফ্সে আম্মারাকে পরাজিত করতে হবে।

ইমাম আলী (আ.)-এর কথা যদি বলি তাহলে বলতে হবে তিনি যেমন আমর ইবনে আবদে উদ, মারহাবের মতো ব্যক্তির নিকট পরাজিত হতে চান নি তেমনি নাফ্সে আম্মারার কাছেও নতি স্বীকার করেন নি।

বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আলী (আ.) তাঁর খেলাফতকালে একদিন একটি কসাইয়ের দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। কসাই তাঁকে দেখে বলল : 'হে আমীরুল মুমিনীন! আজ খুব ভালো গোস্ত আছে। আপনি ইচ্ছা করলে নিতে পারেন।' তিনি বললেন : 'না, আজ আমার হাতে পয়সা নেই।' কসাই বলল : 'অসুবিধে নেই, আপনি পরেই এর মূল্য পরিশোধ করুন।' আমীরুল মুমিনীন বললেন : 'আমি আমার পেটকে কিছু দিন ধৈর্য ধারণ করতে বলব। পেটকে মানিয়ে নিতে না পারলে তোমার কাছ থেকে বাকিতে ক্রয় করতাম। আর যেহেতু আমি আমার পেটকে মানিয়ে নিতে পারছি, তাই তোমার কাছে থেকে বাকিতে গোস্ত করতে ইচ্ছুক নই।'– হিজরত ও জিহাদ, পৃ. ৫৪

নাফ্সকে অনুগত বানানোর জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন আল্লাহর দীনের শিক্ষা। তাই এ লক্ষ্যে যে ব্যক্তি দীন শিক্ষা করে সেও মুজাহিদ।

মহানবী (সা.) বলেছেন : নিজের নাফ্সকে অনুগত বানানোর পরপরই একজন মানুষের কর্তব্য হলো তার পরিবারবর্গকে আল্লাহর অনুগত বানানো।

মহান আল্লাহ বলেছেন :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا ...

হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে রক্ষা কর... –সূরা তাহরীম : ৬

এরপর মানুষের কাজ হচ্ছে বৃহত্তর পরিবেশে জিহাদ করা।

মহানবী (সা.) বলেছেন :

مَنْ رَاءَ مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ

'তোমাদের মধ্যে যে কেউ খারাপ কাজ অনুষ্ঠিত হতে দেখতে পাবে সে যেন তা তার হাত দিয়ে তা বদলে দেয়। যদি তা না পারে তাহলে মুখে তার বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে। আর তা-ও যদি না পারে তাহলে অন্তর দিয়ে তার বিরোধিতা করতে হবে।'

অন্য একটি বর্ণনার শেষে বলা হয়েছে, অন্তর দিয়ে বিরোধিতা করা ঈমানের একেবারে নিম্ন স্তর।

২. শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ

মহান আল্লাহ বলেছেন :

إِنَّ ٱلشَّيۡطَـٰنَ لَكُمۡ عَدُوّٞ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّاۚ

'নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু। অতএব, তোমরা তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ কর।'– সূরা ফাতির : ৬

শয়তানকে শত্রুরূপে গ্রহণ করার অর্থ হলো যে শত্রুকে দমন করার জন্য জিহাদ করতে হবে।

শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ করার অর্থ শয়তানের সব ধোঁকা, প্রতারণা ও প্ররোচনা প্রবল শক্তিতে প্রতিহত করা। শয়তানের সকল ইচ্ছাকে ব্যর্থ করে দেয়া। শয়তানের ইচ্ছা হলো মানুষ আল্লাহর দাসত্ব না করে শয়তানের দাসত্ব করবে। শয়তানের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে :

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾

সে বলল, 'আপনার সম্মানের (পরাক্রমের) শপথ, অবশ্যই আমি তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করব'...– সূরা সাদ : ৮২

শয়তানের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত করা, তার ভেতরের নাফ্সে লাওয়ামা অর্থাৎ ভর্ৎসনাকারী ও অনুশোচনা উদ্রেককারী নাফ্সকে হত্যা করে নাফ্সে আম্মারাকে প্রবল ও শক্তিশালী করে তোলা, যেন মানুষ ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্যের অনুভূতি হারিয়ে একটি পশুতে পরিণত হয়। তাই মুমিনের কর্তব্য হচ্ছে শয়তানের এ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে জিহাদ করা। এ জিহাদ নাফ্সে লাওয়ামাকে প্রবলভাবে জাগ্রত করে নাফ্সে আম্মারাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৩ ও ৪. কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ

পবিত্র কোরআনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾

'হে নবী! অবিশ্বাসী ও কপটদের সঙ্গে জিহাদ কর এবং তাদের ওপর কঠোরতা আরোপ কর; তাদের ঠিকানা তো জাহান্নাম, আর তা অত্যন্ত মন্দ পরিণাম!'– সূরা তাওবা : ৭৩

মহান আল্লাহ যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার আদেশ দিয়ে বলছেন :

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَىْءٍ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

‘এবং তোমরা তাদের (প্রতিরোধের) জন্য যথাসাধ্য শক্তি (সংগ্রহ কর) এবং অশ্বের সারি প্রস্তুত রাখ যাতে এর মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর শত্রু, তোমাদের শত্রু এবং তাদের ছাড়া অন্যদের– যাদের তোমরা জান না, কিন্তু আল্লাহ তাদের জানেন– সন্ত্রস্ত রাখতে পার এবং আল্লাহর পথে যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে তা পুরোপুরি তোমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে, আর তোমাদের প্রতি কোন প্রকার অবিচার করা হবে না।’– সূরা আনফাল : ৬০

অস্ত্র সংগ্রহ ও সেনাবাহিনী তৈরি করা সম্ভব না হলে মুখের ভাষা ব্যবহার করতে হবে। কেননা, অত্যাচারী শাসকের নিকট সুবিচারের কথা বলাও অনেক বড় জিহাদ। মহানবী (সা.) বলেছেন :

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَة حق عند سُلْطَانِ جائرٍ

‘অত্যাচারী শাসকের নিকট সত্য কথা বলা সর্বোৎকৃষ্ট জিহাদ।’– আবু দাউদ

যদি মুখের ভাষা ব্যবহার করতে না পারে তাহলে অন্তত অন্তর দিয়ে জিহাদ করতে হবে। অর্থাৎ অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে হবে আর সুযোগ পেলে সামর্থ্য অর্জিত হলে জিহাদের আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

‘যে লোক মারা গেল, কিন্তু জিহাদ করল না, জিহাদ করার কোন ইচ্ছাও তার মনে জাগে নি, সে মুনাফিকীর একটি অংশ নিয়েই মারা গেল।’– মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ

তাই বলা যায়, যে জিহাদকে অস্বীকার করল সে আসলে মুনাফিক।

হিজরত

জিহাদ সম্পর্কে জানার পর আমরা হিজরত সম্পর্কে জানব। পবিত্র কোরআন এ দুটি শব্দকে পাশাপাশি উল্লেখ করেছে।

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّاۚ لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾

'এবং যারা বিশ্বাস করেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় দিয়েছে এবং তাদের (সর্বপ্রকার সাহায্য ও) সহযোগিতা করেছে তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী; তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।'– সূরা আনফাল : ৭৪

পবিত্র কোরআনে হিজরত সম্পর্কে বলা হয়েছে :

۞ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةًۚ وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٠﴾

এবং যে কেউ আল্লাহর পথে হিজরত করবে সে পৃথিবীতে বহু (নিরাপদ) স্থান ও (ধর্মপালন ও কর্মের ক্ষেত্রে) প্রশস্ততা লাভ করবে। এবং যে কেউ নিজ গৃহ হতে বহিস্কৃত হয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হয়, অতঃপর (লক্ষ্যে পৌঁছানোর পূর্বে) তার মৃত্যু হয়, তবে তার প্রতিদান দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহর ওপর ন্যস্ত। এবং আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, অনন্ত করুণাময়।–সূরা নিসা : ১০০

হিজরতের অর্থ হচ্ছে ঈমান রক্ষার জন্য নিজের ঘর-বাড়ি ও জীবনের মায়া পরিত্যাগ করে এমন কোন ভূখণ্ডে চলে যাওয়া যেখানে ইসলামি বিধানমতো জীবন যাপন করা যায়।

জিহাদ ও হিজরত এ দুটি বিষয়েই ভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা দেয়া হয়।

জিহাদের ব্যাপারে বলা হয় যে, কেবল প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে লড়াই করাই জিহাদ। আর হিজরতের ব্যাপারে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে যে, হিজরত মানে পাপ থেকে হিজরত এবং তা থেকে দূরত্ব অবলম্বন। অর্থাৎ মুহাজির তাকেই বলা যেতে পারে যে, গুনাহসমূহ ত্যাগ করেছে এবং তা থেকে দূরত্ব অবলম্বন করেছে।

এখন এ বিষয়ে একটু আলোকপাত করব।

যদি হিজরতের এ অর্থকে গ্রহণ করা হয় তাহলে পৃথিবীর পাপ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী সকলেই মুহাজির। এ প্রসঙ্গে দুই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে : ফায্‌ল ইবনে আইয়ায এবং বাশার হানী।

১. ফায্‌ল ইবনে আইয়াজ হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যে প্রাথমিক জীবনে একজন নামকরা চোর ও ডাকাত ছিল। অতঃপর তার মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হলো। সকল প্রকার পাপ ও জুলুম নির্যাতন পরিত্যাগ করে দ্বীনের পথে প্রত্যাবর্তন করল। এরপর থেকে সে বুজুর্গ লোকদের মধ্যে গণ্য হতে লাগল। শুধু নিজেই তাকওয়ার অনুসারী হলো না, বরং অন্যদেরকেও ইসলামের দিকে প্রতিনিয়ত আহ্বান করতে লাগল। তাদেরকে একত্রিত করে ইসলামি জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করল। অথচ এর পূর্বে সে ছিল একজ দুর্ধর্ষ ও ভয়ংকর ডাকাত। লোকেরা তাঁর ভয়ে সবসময় সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত থাকত।

একদিনের কথা। চুরি করার উদ্দেশ্যে সে একদিন রাতের বেলা জনৈক ব্যক্তির বাড়ির প্রাচীরের ওপর উঠল। সে তখনো প্রাচীর থেকে নেমে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে নি। বাড়ির মালিক, যিনি একজন আবেদ বা তাপস ব্যক্তি ছিলেন, 'তাহাজ্জুদ নামায' ও দোয়া পাঠান্তে কুরআন শরীফ পাঠ করছিলেন। কুরআন পাঠের মর্মস্পর্শী আওয়াজ তার কানে ভেসে এল। ঘটনাক্রমে গৃহস্বামী তখন কুরআনের এই আয়াত পাঠ করছিলেন :

۞ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ

বিশ্বাসীদের জন্য এখনও কি সে সময় আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের হৃদয় প্রকম্পিত (ও বিগলিত) হয়?– সূরা হাদীদ : ১৬

এ আয়াত শোনার পর সে প্রাচীরের ওপর থেকেই বলতে লাগল : 'কেন নয় হে আল্লাহ! আমার অন্তর সাক্ষ্য দিচ্ছে আপনার দিকে প্রত্যাবর্তনের সময় এসে গেছে।'

সে চুরি-ডাকাতি, মদপান, জুয়া ছেড়ে দিল, সাধ্যমতো মানুষের পাওনা প্রত্যর্পণ করল। এ হিসাবে এ ব্যক্তিও একজন মুহাজির। কারণ, সে গুনাহ ত্যাগ করেছে। –হিজরত ও জিহাদ, পৃ. ৩-৪

২. বাশার হানী : ইমাম মূসা কাযিম (আ.)-এর সময়ে বাগদাদের এক ধনাঢ্য ও সম্পদশালী ব্যক্তি ছিল। একদিন মূসা কাযিম (আ.) তাঁর বাসার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখান থেকে গান-বাদ্য, নর্তকীদের শোরগোল শোনা যাচ্ছিল। তিনি দাসীকে জিজ্ঞেস করলেন : 'এটা কার বাড়ি? এটা কি কোন ক্রীতদাসের ঘর না কোন স্বাধীন লোকের?' দাসী আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলল : ' কেন আপনি কি জানেন না, এটা হচ্ছে সে বিখ্যাত বাশারের বাড়ি যিনি বাগদাদের ধনী ও সম্পদশালী লোকদের অন্যতম? কি করে তিনি একজন ক্রীতদাস হতে পারেন? তিনি তো একজন স্বাধীন লোক।'

এরপর ইমাম বললেন : 'স্বাধীন আছে বলেই তো তার ঘর থেকে শোরগোল বেড়িয়ে আসছে। যদি সে পরাধীন হতো, ক্রীতদাস হতো তাহলে এমনটি হতে পারত না।'

দাসী মালিকের কাছে প্রত্যাবর্তন করল। মালিক দাসীকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল : "এক ব্যক্তি আমাদের ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর মধ্যে খোদাভীরু ও পুণ্যবান লোকদের চিহ্নসমূহ প্রতিভাত হচ্ছিল। তাঁর কপালে ইবাদত-বন্দেগির নিদর্শন জ্বলজ্বল করছিল। তিনি যখন আমাকে দেখলেন, জিজ্ঞাসা করলেন : এই ঘরের মালিক আজাদ না ক্রীতদাস? আমি জবাব দিলাম : 'হ্যাঁ, আজাদ।'

বাশার জিজ্ঞাসা করল : 'এরপর তিনি কী বললেন?' দাসী উত্তর দিল : "তিনি বললেন : 'হ্যাঁ, আজাদ আছে বলেই তো এমনটি হচ্ছে। আর যদি সে স্বাধীন না হতো তাহলে কখনো এমনটি হতে পারত না।"

এসব কথা তার মনে রেখাপাত করল। সে মনে মনে বলল : 'এ ব্যক্তি ইমাম মূসা কাযিম ব্যতীত অন্য কেউ নন।' সে ইমামের খোঁজে বের হলো এবং ইমামের কাছে গিয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। সে বলল : 'ক্রীতদাসের ন্যায় জীবনযাপন করব; আল্লাহর খাঁটি বান্দায় পরিণত হব।'

এই ব্যক্তিও মুহাজির।

সুতরাং হিজরতের এক অর্থ হলো পাপ থেকে দূরে থাকা, অনুরূপভাবে জিহাদের এক অর্থ হলো প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার মোকাবিলা করা। এখন আমরা দেখব এরূপ ব্যাখ্যা সঠিক কি না।

একদিক বিবেচনা করলে একে সঠিক বলে গণ্য করা যেতে পারে, কিন্তু এর বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যাও করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি পাপসমূহ ত্যাগ করেছে সে মুহাজির আর যে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করেছে সে মুজাহিদ। বরং রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : 'নাফ্সের বিরুদ্ধে জিহাদই হচ্ছে বড় জিহাদ।'

তবে এ প্রসঙ্গে যে ভুল ব্যাখ্যা করা হয় তা হলো হিজরত হচ্ছে শুধুই গুনাহ থেকে বিরত থাকার নাম আর জিহাদ হচ্ছে কেবলই প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার নাম।

এরূপ অর্থ দ্বারা একদিকে যেমন শারীরিক এবং বাহ্যিক হিজরত থেকে পশ্চাদ্ধাবনের অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে প্রকাশ্য ও বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ থেকে বিরত থাকার অর্থও গ্রহণ করা হয়েছে।

অন্যভাবে বলা যায়, প্রয়োজনের সময় ঘর-বাড়ি, সন্তান-সন্ততি, বাবা-মা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব থেকে বিদায় নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার পরিবর্তে অন্যায় ও পাপ থেকে বিরত হয়ে ঘরে বসে থাকলে তাকেও মুহাজির বলা হবে। একইভাবে আল্লাহর দীনের পথে শত্রুদের বিরুদ্ধে কষ্ট করে যুদ্ধ করার পরিবর্তে যদি কেউ ঘরে বসে মুরাকাবার অবস্থায় প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত হয় তাকেও মুজাহিদ বলা হবে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধরত সৈনিকদের চেয়েও তার পুণ্য বেশি হবে। কেউ কেউ বলেন, শত্রুরা মুসলমানদের ওপর আঘাত হানবে আর মুসলমানরা ঘরে বসেই শহীদ হয়ে যাবে।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামে এ দুই ধরনের হিজরত ও জিহাদের কথাই বলা হয়েছে। যদি কেউ একটির বাহানায় অন্যটিকে পরিত্যাগ করে তবে বুঝতে হবে সে সঠিক ও সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং ইসলামের চিরন্তন আদর্শ ও শিক্ষা থেকে পলায়ন করেছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.), ইমাম আলী (আ.) ও পরবর্তী ইমামগণ এবং আল্লাহর ওলিগণ সকলেই উভয় অর্থেই মুহাজির ছিলেন এবং উভয় অর্থেই মুজাহিদ ছিলেন।

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষের ওপর বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব-কর্তব্য আরোপিত হয়। এটা সত্য যে, সবসময়ই পরিবেশ-পরিস্থিতি জিহাদের অনুকূলে থাকে না। আবার সবসময়ই হিজরতেরও উপযুক্ত পরিবেশ না থাকতে পারে। মহানবী (সা.) মানুষের কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তার অন্তরে নিষ্ঠা ও সদিচ্ছা লালন করা। তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো এটাই যে, প্রয়োজনে সে হিজরত করবে, প্রয়োজনে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

এ প্রসঙ্গে আবারও রাসূলের ঐ হাদিসের উল্লেখ করা যায় :

مَنْ لَمْ يَغزُ و لَمْ يَحْدُثْ نَفْسَهُ بِلْغَزَبِ وَ مَاتَ عَلى شُعْبَةِ مِنَ النِّفَاقِ

'যে ব্যক্তি জিহাদে শরীক হলো না, জিহাদের কোন কথাও বলল না এবং এ ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনাও করল না, সে মুনাফিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে।

তাই বলা যায়, যারা হিজরতের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে হিজরত করার নিয়্যত রাখে এবং জিহাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে জিহাদে যোগদানের নিয়্যত রাখে তারাই মুহাজির, তারাই মুজাহিদ।

সিফফিনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসার পরে ইমাম আলী (আ.)-এর এক সৈনিক ইমামকে বলল : 'হে আমীরুল মুমিনীন! আমি চেয়েছিলাম আমার ভাই আপনার সঙ্গী হোক ও সৌভাগ্য লাভ করুক।' আলী (আ.) বললেন : 'তার নিয়্যত কী ছিল? সে কি কোন ওজর থাকার কারণে আসতে পারে নি নাকি বিনা ওজরে? যদি বিনা ওজরে হয়ে থাকে তাহলে তার আসার অপেক্ষা না করাই ভালো হয়েছে। আর যদি কোন বিশেষ ওজর থাকার দরুন আসতে পারে নি, কিন্তু তার হৃদয়-মন আমাদের সঙ্গেই ছিল, তাহলে তার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা যখন আমাদের সঙ্গে ছিল তখন সে আমাদের সঙ্গেই ছিল। শুধু তা-ই নয়, আমাদের সঙ্গে সেসব লোকও ছিল যারা এখনো তাদের

পিতা-মাতার ঔরসে রয়েছে। আর এ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। যদি এমন লোক পাওয়া যায় যাদের অন্তরের অন্তস্থলে এ আকাঙ্ক্ষা রয়েছে : 'হায়! যদি আমরা আলীর সাথে থাকতে পারতাম এবং তাঁর সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করতাম'– তাহলে এসব লোক আমাদের কাছে সিফফিনের যোদ্ধাদের মধ্যেই গণ্য।– হিজরত ও জিহাদ, পৃ. ১৬

ইমাম মাহদী (আ.)-এর জন্য আমরা প্রতীক্ষা করছি। তাঁকে উদ্দেশ্য করে আমরা বলি :

يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكَ فَنَفُوْزُ فَوْزاً عَظِيْماً

'হায়! আমরা যদি আপনার সঙ্গে থাকতে পারতাম, তাহলে আমরা বিরাট সাফল্যই লাভ করতে পারতাম!'

আমরা ইমাম হোসাইন (আ.) প্রসঙ্গেও একথা বলে থাকি। কিন্তু এর প্রতি আমরা গুরুত্ব দিই না।

আয়াতুল্লাহ মোতাহ্হারী একজন আলেমের কথা বলেছেন যিনি বলতেন : আমার বিশ্বাসই হয় না যে, ইমাম হোসাইন (আ.) আশুরার রাতে এ কথা বলেছিলেন যে,

مَا رَأَيْتُ أَصْحَاباً أَبَرَّ وَ أَوْفَى مِنْ أَصْحَابِيْ

'আমি আমার সঙ্গীদের চেয়ে উত্তম ও বিশ্বস্ত আর কারো সঙ্গীদের দেখি নি।'

কেননা, আমি বিশ্বাস করতাম ইমামের সঙ্গীরা বিশেষ কোন কর্ম সম্পাদন করেন নি। কারণ, তাঁর শত্রুরা তাঁর সাথে চরম নিষ্ঠুরতা ও অমানুষিকতার পরিচয় দিয়েছিল। হোসাইন ছিলেন মুমিনদের ইমাম, রাসূলের দৌহিত্র, আলী ও ফাতিমার সন্তান। সুতরাং এ অবস্থায় একজন সাধারণ মুসলমান তাঁর সাহায্য না করে পারে না। কাজেই কারবালায় যাঁরা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন তাঁরা তেমন কোন বড় কীর্তি সম্পাদন করেন নি। আর যারা তাঁকে সাহায্য করে নি তারা তো বিরাট ভুল ও অন্যায় করেছে।

এরপর সেই বুজুর্গ ব্যক্তি বলেন : আল্লাহ তা'আলা আমার ভুল ধারণা থেকে মুক্তি দিলেন। একরাতে আমি স্বপ্ন দেখলাম– আমি কারবালা ময়দানে হযরত ইমাম হোসাইন (আ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। সাক্ষাতের পর তাঁকে বললাম : হে আমার

মাওলা! আমি আপনার দরবারে এই জন্যই উপস্থিত হয়েছি যে, আপনাকে সাহায্য করব এবং আপনার সাহচর্য লাভ করে ধন্য হব। ইমাম বললেন : ঠিক আছে, সময় আসলে পরে তোমাকে জানিয়ে দেব।' এমন সময় নামাযের (যোহর) সময় হয়ে গেল। আবু আবদুল্লাহ হোসাইন বললেন : 'আমি নামায পড়তে চাই। আর তুমি এখানে অবস্থান করে দুশমনের হামলা প্রতিহত কর। দুশমনের পক্ষ থেকে যদি কোন তীর নিক্ষিপ্ত হয়, তাহলে সামনে অগ্রসর হয়ে তা প্রতিহত করবে।' আমি বললাম : ঠিক আছে।, আমি এখানেই অবস্থান করব। অতঃপর আমি ইমামের সম্মুকে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমি সহসা দেখতে পেলাম যে, একটি তীর তীব্র বেগে ইমামের দিকে ছুটে আসছে। যখন তীরটি খুব কাছে এসে পৌঁছল তখন অনিচ্ছাকৃতভাবে আমি কিছুটা পিছনের দিকে সরে গেলাম। আর অমনি তীরটি ইমামের পবিত্র দেহে বিদ্ধ হলো। আমি সহসা বলে উঠলাম :

আহ আমি কী করলাম! আমি তো মারাত্মক ভুল ও অপরাধ করেছি। ঠিক আছে, আর এমনটি করব না। ইত্যবসরে আরেকটি তীর এসে ইমামের পবিত্র দেহে বিদ্ধ হলো। অথচ এবারও আমি নিজেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে পিছনে সরে দাঁড়ালাম। এইভাবে তৃতীয় বারও আমি অনুরূপই করলাম। আর একের পর এক তীর এসে ইমামের পবিত্র শরীরে বিদ্ধ হতে লাগল।

অতঃপর আমি সহসা ইমামের দিকে তাকালাম। তিনি স্মিত হাস্যে বললেন :

مَا رَأَيْتُ أَصْحَاباً أَبَرَّ وَ أَوْفَى مِنْ أَصْحَابِيْ

'আমি আমার সঙ্গীদের চেয়ে উত্তম ও বিশ্বস্ত আর কারো সঙ্গীদের দেখি নি।'

তোমরা সবাই ঘরে বসে বলছ :

يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكَ فَنَفُوْزُ فَوْزاً عَظِيْماً

বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাবে তোমাদের এ দাবি কতটা সত্য? আমার সঙ্গীরা ছিল সত্যিকার কাজের লোক, তারা কেবল মৌখিক দাবির অধিকারী ছিল না।– হিজরত ও জিহাদ, পৃ. ২০-২২

হিজরত

অনেকের ধারণা হিজরত একটি ঐতিহাসিক ঘটনা যা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ঘটেছিল এবং নবী (সা.) এবং তাঁর অনুসারী সাহাবিগণ মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে মদীনায় চলে গিয়েছিলেন। আর এ ঘটনা হিজরি সালের ভিত্তি রচনা করেছিল।

কিন্তু এটি মোটেই ঠিক নয়, হিজরত কেবল ইসলামের প্রাথমিক যুগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এ নির্দেশ কোন কাল বা স্থানের জন্যও সীমাবদ্ধ নয়; বরং এ নির্দেশ বর্তমানেও যেমন বলবৎ রয়েছে তেমনি কিয়ামত পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে।

হিজরতের প্রকৃত অর্থ

হিজরতের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে ঈমান রক্ষার জন্য ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাওয়া। তাই যখনই আমাদের ঈমান সংকটের সম্মুখীন হবে, অমাদের সমাজ এবং ইসলামের ওপর নানা ধরনের বিপদ আসবে তখন যদি সেই বিপদ মোকাবিলা করার মতো অবস্থা না থাকে তাহলে ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে আমাদেরকে হিজরত করতে হবে।

পবিত্র কোরআনে একটি আয়াতে রয়েছে যার মধ্যে সেসব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা পরিবেশের বাধ্যবাধকতার ওজর তুলে আত্মারক্ষার চেষ্টা করে। বর্তমানে অনেকেই এ অজুহাত পেশ করে। যদি কাউকে বলা হয় কেন আপনি এ ধরনের ভুল করছেন, অন্যায় করছেন, যদি কোন মহিলাকে বলা হয় কেন আপনি পর্দা ছাড়াই ঘরের বাইরে এসেছেন? তখন তারা জবাব দেয় পরিবেশটাই এমন, এখানে আমাদের কিছুই করার নেই। যদি কাউকে বলা হয় কেন আপনি হারাম খাদ্য গ্রহণ করছেন বা এমন অনুষ্ঠানে কেন যাচ্ছেন যেখানে মদপান করা হয়, তখন জবাব দেয়া হয়, পরিবেশ-পরিস্থিতিই এমন। পরিবেশ ও সমাজের বাইরে তো আমরা যেতে পারি না। কিন্তু ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে এ অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়। কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ এ অজুহাত গ্রহণ করবেন না।

তাহলে আমাদের কর্তব্য কী? আমাদের কর্তব্য হচ্ছে :

প্রথম আমাদের পরিবেশকে সংশোধন করার চেষ্টা করা এবং তাকে ইসলামি ব্যবস্থার অনুকূলে গড়ে তোলা। কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব?

যদি আমাদের এলাকায় মসজিদ না থাকে তবে মসজিদ স্থাপন, সেখানে কোরআন-সুন্নাহর শিক্ষা দান, এলাকার মানুষকে ইসলামি বিধানের প্রতি সচেতন করা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা, সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করা এরূপ আরো পদক্ষেপ।

কিন্তু যদি আমরা দেখি যে, আমাদের পরিবেশ ও সমাজকে ইসলামি বিধানমতো গড়ে তুলতে পারছি না এবং আমাদের ছেলে-মেয়ে ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের ঈমান রক্ষা করাই কঠিন হয়ে পড়েছে তখনই ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে এ ধরনের পরিবেশ ও সমাজ ত্যাগ করা। এটা এক দেশ থেকে অন্য দেশে হতে পারে, দেশের এক শহর থেকে অন্য শহর হতে পারে, এমনকি একটি শহরের এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় হতে পারে।

অনেক বড় শহরেই এমন দেখা যায় যে, কোন এলাকায় ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা হয় বেশি আবার কোন এলাকায় ধর্মের কোন অস্তিত্বই নেই।

যদি ঢাকার দিকে তাকাই তাহলে দেখব, একটি অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতিটা বেশি লক্ষ্য করা যায়, এর বিপরীতে অপর একটি অংশের অবস্থাটা কেমন! সকালে উঠে বাইরে বের হয়ে হয়তো শোনা যাবে গান-বাজনার আওয়াজ, সকালে কুকুর নিয়ে মর্নিং ওয়াকে বের হওয়া লোকদের দেখা যাবে, রাত্রিতে আলট্রা মডার্ন পোশাক পড়া ছেলে-মেয়ে, এমনকি বৃদ্ধ-পৌঢ়দেরকেও দেখা যাবে। যেসব পিতামাতা ইসলামি পরিবেশে বড় হয়েছে, তাদের ওপর এগুলো প্রভাব না ফেললেও তাদের ছোট ছোট বাচ্চাদের ওপর নিঃসন্দেহে এগুলো প্রভাব বিস্তার করবে, যারা চোখ মেললেই এসবের সাথে পরিচিত হতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। একটা পর্যায়ে গিয়ে এসব ছেলে-মেয়েকে আর ইসলামি বিধানে নিবেদিত রাখা সম্ভব হয় না। তাই এখানেও হিজরতের বিষয়টি চলে আসে।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে বলেন :

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾

নিশ্চয় যাদের রূহ ফেরেশতাগণ এরূপ অবস্থায় পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছে যে, তারা নিজেদের (জীবনের) প্রতি অবিচার করছিল, (ফেরেশতারা তাদের) বলছিল, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে?' তারা বলল, 'আমরা পৃথিবীতে দুর্বল (ও অসহায়) ছিলাম'; (ফেরেশতাগণ) বলল, 'আল্লাহর পৃথিবী (ভূমি) কি প্রশস্ত ছিল না যে, তুমি হিজরত করে যেতে?' সুতরাং এমন লোকদেরই ঠিকানা হল জাহান্নাম, আর তা নিকৃষ্ট পরিণাম।– সূরা নিসা : ৯৭

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, হিজরতকে ইসলামে কতটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

و من يخرج من بيته-'আর যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয়'– এ আয়াতের অর্থের ব্যাপারে কিছু সংখ্যক লোক অতিরঞ্জিত করেছে যার ফলে অনেক ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে।

তারা বলে : যে ব্যক্তি নিজ গৃহ থেকে বের হয় এবং আল্লাহ ও রাসূলের দিকে গমন করে– এটি ঠিক যে, এ ব্যাপারে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। আলোচ্য আয়াতের শুরুতে ঘরের কথা বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি হিজরতের ব্যাপার অন্তরের সাথে জড়িত– অন্তরের নিষ্ঠার সাথেই তা জড়িত। এ নয় যে, ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে অন্য দেশে বা এলাকায় চলে যেতে হবে। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হলো ঘরের এককোণে বসে আল্লাহর যিকির করা, স্বীয় আত্মশুদ্ধির অনুশীলন চালানো, আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা, নামায পড়া, রোযা রাখা ও দোয়া-কালাম পড়া।

এখানে একটি প্রশ্ন আসে যে, সফরের লক্ষ্য কী? এর জবাব হলো : এর লক্ষ্য হলো আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া। সুতরাং আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য কতগুলো পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। আর সেসব পর্যায় অতিক্রম করার জন্য সফরের প্রয়োজন,

নিজের আমিত্বকে ত্যাগ করা প্রয়োজন। বাহ্যিকভাবে কোন বাসস্থান ত্যাগের প্রয়োজন নেই।

আর এ দৃষ্টিতে কোরআনের উপরিউক্ত আয়াতের অর্থ হলো স্বীয় আমিত্ব ও মনোজগৎ থেকে বের হয়ে আল্লাহর দিকে হিজরত করা। তাহলেই আল্লাহ এর প্রতিদান প্রদান করবেন।

এ ধরনের ব্যাখ্যা ভুল ব্যাখ্যা। কেননা, কোরআন মজীদ উভয় হিজরতের কথাই বলেছে। লক্ষ্যযোগ্য বিষয় হচ্ছে, কোরআনে গৃহ বলতে মনুষ্যনির্মিত ঘরকেই বুঝানো হয়েছে।

তবে বিষয়টি হচ্ছে এরকম যে, যদি কেউ স্বীয় ঘর-বাড়ি থেকে হিজরত করে তাহলে এর উদ্দেশ্য যেন হয় আল্লাহকে লাভ করা। অর্থাৎ তার নিয়্যত হবে আল্লাহর নৈকট্য লাভ। যদি আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্য না থাকে তবে এর কোন মূল্যই নেই। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : যার হিজরত হবে আল্লাহ ও তার রাসূলের উদ্দেশে তার হিজরত আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশ্যেই গণ্য হবে। আর যার হিজরত হবে পার্থিব ধন-সম্পদের উদ্দেশ্যে, সে তা-ই পাবে অথবা যদি তা হয় কোন নারীকে লাভ করার জন্য তবে তার হিজরত সেদিকেই গণ্য যার জন্য সে হিজরত করেছে।

তাই প্রকৃতপ্রস্তাবে মুহাজির তাকেই বলা হবে যে নিষ্ঠাসহ আল্লাহর উদ্দেশে আল্লাহর পথেই হিজরত করে।

জিহাদের বিষয়েও একই কথা। জিহাদ যদি সুনাম অর্জনের জন্য হয়, অথবা পার্থিব ধন- দৌলতের জন্য হয়, অথবা সুন্দরী নারীকে বিয়ে করার জন্য হয়, তাহলে জিহাদ বলে গণ্য হবে না। একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই জিহাদ করতে হবে। ওহুদের যুদ্ধে এক সৈনিকের ঘটনা–

সৈনিকের বক্তব্য : মদীনার লোকদের পক্ষে যুদ্ধে এসেছে, পরে আত্মহত্যা করে।

মানুষকে উভয় অর্থেই জিহাদ ও হিজরত করতে হবে। অনেকে হিজরতকে ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, যারা দীন শিক্ষার জন্য বের হয় তারাও মুহাজির, যদি তাদের লক্ষ্য হয় নিজে শিক্ষা লাভ করে অন্যদের শিক্ষা দেয়া। তেমনিভাবে অন্য কোন প্রয়োজন পূরণের বিষয়টিও এসেছে। যেমন : ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়া। তবে উদ্দেশ্য যদি অর্থ উপার্জন হয়, তবে তা এর মধ্যে গণ্য হবে না।

ইমাম মাহদী (আ.) ও মাহদাভীয়াত

সংকলন : মো. আশিফুর রহমান

শিয়া-সুন্নি নির্বিশেষে আপামর মুসলিম উম্মাহ্ ঐকমত্য পোষণ করে যে, মহানবী (সা.)-এর বংশধারার সর্বশেষ ইমাম হচ্ছেন ইমাম মুহাম্মদ আল মাহ্দী (আ.), যিনি শেষ যামানায় আবির্ভূত হয়ে বিশ্বব্যাপী ইসলামি হুকুমত এবং ন্যায়বিচার কায়েম করবেন এবং পৃথিবীর বুক থেকে অন্যায়-অত্যাচার ও শোষণের পরিসমাপ্তি ঘটাবেন। তাঁর আগমন অবশ্যম্ভাবী এবং এতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। হযরত আবু সাইদ খুদরী থেকে আহমাদ বর্ণনা করেছেন যে,মহানবী (সা.) বলেছেন : 'আমি তোমাদেরকে মাহদী সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছি।'– নুরুল আবসার, পৃ. ২৩১

ইমাম মাহ্দী (আ.) সংক্রান্ত শিয়াদের আকীদা-বিশ্বাস

শিয়াদের বিশ্বাস মতে প্রথম নিষ্পাপ ইমাম হলেন আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবী তালিব (আ.) এবং সর্বশেষ ইমাম হলেন প্রতিশ্রুত হযরত মাহ্দী– মুহাম্মদ ইবনে হাসান আল-আসকারী (আ.)– যাঁর জন্য সবাই অপেক্ষমাণ এবং যিনি ২৫৫ হিজরিতে ইরাকের সামার্‌রা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর জীবন দীর্ঘায়িত করেছেন এবং তাঁকে মানুষের দৃষ্টিশক্তির অন্তরালে গোপন রাখবেন ঐ দিন পর্যন্ত যে দিন তিনি তাঁর ঐশী প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন ও তাঁকে আবির্ভূত করবেন এবং তাঁর মাধ্যমে সকল ধর্মের ওপর ইসলামকে বিজয়ী ও সমগ্র পৃথিবীকে ন্যায়বিচার দিয়ে পরিপূর্ণ করবেন।

ইমাম মাহ্দী (আ.) সংক্রান্ত আহ্লে সুন্নাতের আকীদা-বিশ্বাস

প্রতীক্ষিত মাহ্দী (আ.) সংক্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস কেবল শিয়াদের সাথেই সংশ্লিষ্ট নয়। শিয়াদের কাছে যেমন এটি মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস ঠিক তেমনি আহ্লে সুন্নাতের কাছেও এটি একটি মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস। আহ্লে সুন্নাতের নির্ভরযোগ্য হাদিস সংকলন গ্রন্থ হচ্ছে ও অন্যান্য সূত্রে অসংখ্য হাদিস রয়েছে। এখানে একটি মাত্র হাদিস উল্লেখ করা হলো যা অনেক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

মহানবী (সা.) বলেছেন : 'এমনকি সমগ্র বিশ্বের আয়ু যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে এবং কিয়ামত হতে একদিনও অবশিষ্ট থাকে তাহলেও মহান আল্লাহ্ ঐ দিবসকে এতটা দীর্ঘায়িত করবেন যাতে তিনি ঐ দিবসেই আমার আহ্লে বাইতের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির শাসনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারেন যাকে আমার নামেই ডাকা হবে। পৃথিবী অন্যায়-অত্যাচারে ভরে যাওয়ার পর সে তা শান্তি ও ন্যায়ে পূর্ণ করে দেবে।' (তিরমিযী ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৬, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৭৪-৭৫; আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭; মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৬, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৩; মুস্তাদরাকুস্ সাহীহাইন (হাকেম), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৫৭; আল মাজমা (তাবারানী), পৃ. ২১৭; তাহযীবুস্ সাবিত (ইবনে হাজার আসকালানী), ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৪৪; আস সাওয়ায়িকুল মুহ্রিকাহ্ (ইবনে হাজার হাইসামী), ১১শ অধ্যায়, উপাধ্যায় ১, পৃ. ২৪৯; কানযুল উম্মাল, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৮৬; ইকদুদ দুরার ফী আখবারিল মাহ্দী আল মুনতাযার, ১২শ খণ্ড, ১ম অধ্যায়; আল বায়ান ফী আখবারি সাহিবিয যামান (গাঞ্জী শাফিয়ী), ১২শ অধ্যায়; ফাতহুল বারী (ইবনে হাজার আসকালানী), ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩০৫; আল তাযকিরাহ্ (কুরতুবী), পৃ. ৬১৭; আল হাভী (সুয়ূতী), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৫-১৬৬; শারহুল মাওয়াহিবুল লাদুন্নীয়াহ্ (যুরকানী), ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৮; ফাতহুল মুগীস (সাখাভী), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১; আরজাহুল মাতালিব (উবায়দুল্লাহ্ হিন্দী), পৃ. ৩৮০; আল মুকাদ্দিমাহ্ (ইবনে খালদুন), পৃ. ২৬৬; জামিউস সাগীর (সুয়ূতী), পৃ. ১৬০; আল উরফুল ওয়ারদী (সুয়ূতী), পৃ. ২।

আশ শাফিয়ী (ওফাত ৩৬৩/৯৭৪) বলেছেন যে, এ হাদিস বিপুলসংখ্যক সূত্রে বর্ণিত এবং বহু বর্ণনাকারী কর্তৃক তা মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র বর্ণিত ও প্রচারিত হয়েছে।

এছাড়া হাদিসটি ইবনে হিব্বান, আবু না'ঈম, ইবনে আসাকির প্রমুখ কর্তৃক লিখিত গ্রন্থাদিতেও উদ্ধৃত হয়েছে।

আহ্‌লে সুন্নাতের প্রসিদ্ধ হাদিস বিশারদগণ ইমাম মাহ্‌দী (আ.) সংক্রান্ত অগণিত হাদিস ও রেওয়ায়াত অনেক সাহাবী ও তাবেয়ীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যা তাঁদের বড় বড় প্রামাণ্য ও প্রসিদ্ধ হাদিস ও ইতিহাসের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম মাহ্‌দী (আ.), তাঁর গুণাবলী এবং তাঁর আবির্ভাবের নিদর্শন সংক্রান্ত মহানবী (সা.)-এর হাদিসসমূহ আহ্‌লে সুন্নাতের প্রাচীন প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য হাদিস গ্রন্থসমূহে এত অধিক পরিমাণে বিদ্যমান যে, আহ্‌লে সুন্নাতের বড় বড় হাদিসশাস্ত্রবিদ ও হাফেয ইমাম মাহ্‌দী সংক্রান্ত হাদিসগুলোকে মুতাওয়াতির অর্থাৎ অকাট্যসূত্রে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত বলে মত প্রকাশ করেছেন।

তাই যারা ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আবির্ভাবে বিশ্বাসী নয় বা ইমাম মাহ্‌দী সংক্রান্ত বিশ্বাসকে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেয় অথবা শাব্দিকভাবে 'হেদায়াতপ্রাপ্ত' অর্থে 'মাহ্‌দী' শব্দের ব্যাখ্যা করে অথবা বলতে চায় যে, শেষ যামানায় 'মাহ্‌দী' নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি হবেন না; বরং প্রতি যুগের মুজাদ্দিদ বা ধর্মসংস্কারক আলেমই হবেন মাহ্‌দী, এমনকি তিনি হয়তো নিজেও তা বুঝতে পারবেন না; তাঁর মৃত্যুর পর জনগণ তাঁর কর্মকাণ্ড, অবদান ও কর্মবহুল জীবন অধ্যয়ন করে বুঝতে পারবে যে, তিনি মাহ্‌দী ছিলেন– তাদের উদ্দেশে এ কথা বলাই যথেষ্ট যে, তারা ঈমান, ইসলাম এবং আপামর মুসলিম উম্মাহ্‌র অন্যতম মৌলিক অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করেছে যা মুতাওয়াতির হাদিস ও রেওয়ায়েতের মাধ্যমে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। আর ধর্মের অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করা ঈমান, ইনসাফ ও আদালতের পরিপন্থী। অতএব, ইমাম মাহ্‌দী সম্পর্কে গুটিকতক লোকের এ জাতীয় বিরল অভিমতের কোন তাত্ত্বিক মূল্য নেই।

ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে সুসংবাদ ও তাঁর বংশ

মহানবী (সা.) ইমাম মাহদী (আ.)-এর জন্মের সুসংবাদ প্রদান করেছেন এবং বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বংশধারায় জন্মগ্রহণ করবেন।

মহানবী (সা.) বলেছেন :'যদি পৃথিবীর জীবন আর একদিনও অবশিষ্ট না থাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ দিনটিকে এত দীর্ঘ করে দেবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি এক ব্যক্তিকে আমার বংশ থেকে নিয়োগ দেবেন।'–সহীহ, আবু দাউদ, ৪র্থ খণ্ড,পৃ. ৮৭

ইবনে হাজার তাঁর 'সাওয়ায়েক্ব' গ্রন্থের ৯৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে রুইয়ানি, তাবরানী ও অন্যরা মহানবী (সা.) থেকে এ ধরনের একটি হাদিস এনেছেন যে : 'মাহদী আমার বংশ থেকে।'

ইমাম মাহদী (আ.) ইমাম আলী ও হযরত ফাতিমা (আ.)-এর বংশধর

ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : 'নিশ্চয়ই আলী আমার পরে আমার উম্মতের ইমাম এবং তার সন্তানদের মাঝ থেকে 'ক্বায়েম' আসবে, এবং যখন সে আবির্ভূত হবে তখন সে পৃথিবীকে ন্যায়বিচার ও ইনসাফে পূর্ণ করে দেবে যেভাবে তা নিষ্ঠুরতা ও নিপীড়নে পূর্ণ ছিল।'–ইয়া নাবিউল মুওয়াদ্দাত, ৪৯৪ পৃ. (খাওয়ারাযমীর 'মানাক্বেব' থেকে)

'নুরুল আবসার'- এর লেখক আবু আবদুল্লাহ গাঞ্জি থেকে ২২৮ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন : আল্লাহ বলেন :

لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ

'যেন তা সব ধর্মের ওপরে বিজয় লাভ করে, মুশরিকরা তা যতই অপছন্দ করুক।'–সূরা আস সাফ্ফ : ৯

সাইয়্যেদ ইবনে জুবায়ের বলেন : 'তা মাহদীর কথা বলে যিনি ফাতেমা (আ.)-এর বংশধর, যিনি এ আয়াতের আদেশ বলে সব ধর্মের ওপর বিজয় লাভ করবেন।'

হযরত উম্মে সালামা বলেন : 'আমি নবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি :'মাহদী আমার বংশ থেকে, ফাতেমার সন্তানদের মাঝ থেকে'।"–সহীহ আবু দাউদ, ৪র্থ খণ্ড, ৮৭ পৃ.

কাতাদা থেকে বর্ণিত হয়েছে :"আমি সাইদ ইবনে মুসাইয়্যেবকে জিজ্ঞেস করলাম : 'মাহদী সম্পর্কে কি কোন সত্যতা আছে?' তিনি বললেন : 'হ্যাঁ, তিনি সত্য এবং তিনি ফাতেমার বংশ থেকে'।"–ইয়ানাবিউল মুওয়াদ্দা, পৃ. ৪৩২

ইমাম মাহদী (আ.) ইমাম হোসাইন (আ.)-এর বংশ থেকে

ইমাম মাহদী (আ.) ইমাম হোসাইন (আ.)-এর বংশে জন্মগ্রহণ করবেন বলে হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত সালমান ফারসী বলেন : "আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করলাম। আমি যা দেখলাম তা হলো হোসাইন ইবনে আলী তাঁর কোলে বসে আছে এবং নবী (সা.) তাঁর চোখের ওপর চুমু দিচ্ছেন এবং তার জামা চুষছেন এবং বলছেন : 'তুমি একজন সর্দার, একজন সর্দারের সন্তান এবং একজন সর্দারের ভাই। তুমি একজন ইমাম, একজন ইমামের সন্তান এবং একজন ইমামের ভাই। তুমি একজন ঐশী প্রমাণ, একজন ঐশী প্রমাণের ভাই এবং নয় জন ঐশী প্রমাণের পিতা এবং তাদের নবম জন হচ্ছে ক্বায়েম।"– ইয়ানাবিউল মুওয়াদ্দা, পৃ. ৪৯৩ (মুয়াফ্ফাক্ব ইবনে আহমাদ খাওয়ারাযমীর 'মানাক্বিব' থেকে)

ইমাম মাহদী (আ.) ইমাম হাসান আল আসকারীর সন্তান

ইমাম রেযা (আ.) বলেন :'নিশ্চয়ই আমার পরে ইমাম হবে আমার সন্তান মুহাম্মাদ তাক্বী জাওয়াদ এবং তার পরে ইমাম হবে তার সন্তান আলী হাদী নাক্বী এবং তার পরে ইমাম হবে তার সন্তান হাসান আসকারী এবং তার পরে ইমাম হবে তার সন্তান মুহাম্মাদ হুজ্জাত মাহদী মুনতাযার।'– ফারায়েদুস সিমতাঈন

ইমাম মাহদী (আ.)-কে অস্বীকারকারী কাফের

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী বর্ণনা করেন যে, নবী (সা.) বলেছেন :'যে ব্যক্তি মাহদীর আগমনকে অস্বীকার করল সে অবশ্যই অবিশ্বাস করল যা আল্লাহ মুহাম্মাদের ওপর নাযিল করেছেন এবং যে ঈসা-র আগমনকে অস্বীকার করল অবশ্যই সে অবিশ্বাসীতে পরিণত হলো এবং যে দাজ্জালের বিদ্রোহকে অস্বীকার করলো সে অবশ্যই অবিশ্বাসীতে পরিণত হলো।'– ইয়ানাবিউল মুওয়াদ্দা, পৃ. ৪৪৭ (শেইখ আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবনে ইয়াকুব এর 'ফারায়েদুস সিমতাইন' বই থেকে)

ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর জন্ম

শিয়া-সুন্নি নির্বিশেষে সবার কাছে মহানবী (সা.) কর্তৃক প্রদত্ত প্রতীক্ষিত আল মাহ্দী সংক্রান্ত সুসংবাদ প্রমাণিত হওয়া, তাঁর আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও মিশন, তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও পবিত্র ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর আবির্ভাব ও বিপ্লবের নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্যসমূহের ক্ষেত্রে কোন মতপার্থক্য নেই। এতৎসংক্রান্ত একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে, শিয়ারা বিশ্বাস করে যে, দ্বাদশ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আল আসকারী (আ.) ২৫৫ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং মহান আল্লাহ্ যেমনভাবে হযরত খিযির (আ.)-এর বয়স দীর্ঘ করেছেন তেমনি তিনি তাঁর জীবনকেও দীর্ঘায়িত করেছেন। তাই তিনি জীবিত আছেন এবং মহান আল্লাহ্ কর্তৃক আবির্ভূত হবার অনুমতি দেয়া পর্যন্ত তিনি অন্তর্ধানে থাকবেন। অন্যদিকে আহ্লে সুন্নাতের অধিকাংশ আলেম বিশ্বাস করেন যে, তিনি যে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং বর্তমানেঅন্তর্ধানে আছেন তা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় নি; বরং তিনি ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করবেন এবং মহানবী (সা.) তাঁর সম্পর্কে যে সুসংবাদ দিয়েছেন তা তিনি বাস্তবায়ন করবেন। তবে অল্প সংখ্যক সুন্নি আলেম আমাদের (বারো ইমামী শিয়াদের) সাথে ইমাম মাহ্দী (আ.) যে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং অন্তর্ধানে আছেন সে ব্যাপারে একমত প্রকাশ করেছেন।

সূফী হাদিসবেত্তা মুহাম্মাদ খাজা বুখারী তাঁর বই 'ফাসলুল খেতাব'এ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইমাম মুহাম্মাদ জাওয়াদ (আ.)-এর কন্যা হাকিমাহ এবং আবু মুহাম্মাদ হাসান আসকারী (আ.)-এর ফুপু সবসময় প্রার্থনা করতেন ও কাঁদতেন এবং আল্লাহর কাছে চাইতেন তিনি যেন তাঁকে হযরত এর পুত্র সন্তান-এর সাক্ষাৎ লাভে সফলতা দেন। ২৫৫ হিজরির ১৫ই শাবান যখন তিনি হযরত হাসান আসকারীর সাথে সাক্ষাৎ করলেন তখন হযরত তাঁকে তাঁর সাথে থাকতে বললেন, কারণ, একটি ঘটনা ঘটবে। তাই তিনি ঐ জায়গায় থেকে গেলেন। খুব সকালে নারজিস বেগম (ইমাম মাহদীর মা) অসুবিধা বোধ করতে লাগলেন। তখন হাকিমাহ তাঁর কাছে দ্রুত গেলেন এবং এর কয়েক মুহূর্ত পর নারজিস বেগম খতনা করা এক বরকতময় সন্তান প্রসব করলেন। যখন হাকিমাহর দৃষ্টি বাচ্চার ওপর পড়লো তিনি তাঁকে কোলে তুলে নিলেন এবং ইমাম হাসান আসকারীর কাছে গেলেন। হযরত হাসান আসকারী তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁর বরকতময় হাত পিঠ ও চোখে বুলিয়ে দিলেন এবং তাঁর মুখের ওপর মুখ রাখলেন। এরপর তিনি 'আযান' দিলেন বাচ্চার ডান কানে এবং

'আকামাত' দিলেন তাঁর বাম কানে। এরপর বললেন, 'হে ফুপু! তাকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যান।' হাকিমাহ তা পালন করলেন এবং বাচ্চাকে তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে গেলেন। হাকিমাহ বলেন, 'আবার আমি আবু মুহাম্মাদ হাসান আসকারীর বাসায় গিয়েছিলাম। হঠাৎ আমি দেখলাম হযরত একটি হলুদ জামা পড়া বাচ্চাকে বহন করছেন যার চেহারা আলোতে উজ্জ্বল হয়ে আছে।' তখন তার ভালোবাসা আমার হৃদয়কেআচ্ছাদিত করল এবং আমি বললাম, 'হে আমার ওয়ালী (অভিভাবক)! এ বরকতময় বাচ্চা সম্পর্কে আপনার কী বলার আছে?' তিনি বললেন- 'হে ফুপু! সে সেই প্রতীক্ষিত জন যার সম্পর্কে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।' তখন আমি নিজেকে মাটিতে ফেলে দিলাম এবং আল্লাহকে সিজদা করলাম কৃতজ্ঞতা জানিয়ে।'– (ইয়া নাবিউল মাওয়াদ্দার ৩৮৭ পৃষ্ঠায় লিখিত বর্ণনা)

বেশ কিছু সুন্নি আলেম, হাদিসবেত্তা এবং ঐতিহাসিকের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো যাঁরা তাঁদের গ্রন্থে ইমাম মাহদী (আ.)-এর জন্ম হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন- 'ইসাফুর রাগেবীন' অনুযায়ী শেই মহিউদ্দীন আরাবীর 'ফুতুহাতুল মাক্কিয়্যাহ'; শেইখ আবদুল ওয়াহহাব শারানীর কিতাব 'আল ইওয়াকিত- ওয়াল- জাওহার'; শেইখ মুহাম্মাদ ইবনে ইউসূফ গাঞ্জীর কিতাব 'আল বায়ান আখবার সাহেবুয যামান'; 'নুরুল আবসার' অনুযায়ী ইবনে ওয়ারদীর 'তারিখ'-এ; ইবনে হাজার হাইসাামীর কিতাব 'সাওয়ায়েক্কুল মুহরেক্বা'; সেবতে ইবনে জওযীর কিতাব 'তাযকেরাতুল আইম্মা'; শেইখ নুরুদ্দীন আলীর কিতাব 'ফুসুলুল মুহিম্মা'; বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লেকানের কিতাব 'ওয়াফায়াতুল আইয়ান'; সূফী আলেম শেইখ মোহাম্মাদ খাওয়াজার 'ফাসলুল খেতাব'; সাইয়্যেদ মুমিন শাবলানজির 'নুরুল আবসার'; সূফী আলেম শেইখ কুন্দুযির 'ইয়ানাবিউল মুওয়াদ্দা'; বর্তমান যুগের বংশ ইতিহাসবিদ আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর সাইয়্যেদ হোসেইন রাফাঈ তাঁর 'নুরুল আনওয়ারেশ' কিতাবে।

ইমাম মাহদী (আ.)-এর উপাধি

ইমাম মাহদীর নাম হলো মুহাম্মাদ এবং তাঁর ডাক নাম আবুল ক্বাসিম। ইমামিয়া শিয়ারা তাঁকে এসব উপাধি দিয়েছে, যেমন হুজ্জাত, মাহদী, খালাফে সালেহ, ক্বায়েম

এবং সাহেবুয্‌যামান। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে 'মাহদী' উপাধি।– নুরুল আবসার

ইমাম মাহদী (আ.)-এর গুণ-বৈশিষ্ট্য

জাবের ইবনে ইয়াযদী জাবের ইবনে আবদুল্লাহিল আনসারী থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : 'মাহদী আমার সন্তান। তার নাম ও উপাধি আমার নাম ও উপাধির মতো। সমস্ত মানুষের মাঝে সে সৃষ্টিতে ও চরিত্রে আমার মতো হবে।'– ইয়ানাবিউল মুওয়াদ্দা, পৃ. ৪৯৩ (খাওয়ারাযমীর 'মানাক্বেব' থেকে)

আহলে বাইতের ইমামগণের মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি সংক্রান্ত অসংখ্য হাদিস ও রেওয়ায়াত বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। ইমামগণের সকলেই জ্ঞানী, ইবাদতগুজার ব্যক্তি ও অতুলনীয় নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তবে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কোন কোন দিক একেক ইমামের মধ্যে অধিকমাত্রায় প্রতিফলিত হওয়ায় জনসাধারণ ইমামগণকে সেসব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। এখানে ইমাম মাহদী (আ.) কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো।

ইমাম মাহদী (আ.)-এর জ্ঞান

ইমাম মাহদী (আ.) হবেন সবচেয়ে জ্ঞানী এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় দক্ষতার অধিকারী। কারণ, তিনি তাঁর প্রপিতামহ মহানবী (সা.)-এর উত্তরসূরি এবং তিনি নবুওয়াতি প্রজ্ঞার ভাণ্ডারের সংরক্ষক। তিনি ধর্মীয় আইন-কানুন ও মহানবীর শরীয়তের সব বিষয়ে সর্বোচ্চ অবগত। পূর্ববর্তী মাসুম ইমামগণ তাঁর জন্মের বহু আগেই তাঁর উচ্চ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে বলে গিয়েছেন।

আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে বলেন : 'সে বড় আশ্রয়-দানকারী এবং সবচেয়ে জ্ঞানী এবং আত্মীয়দের প্রতি রহমদিল।'

ইমাম মাহদী (আ.) আনতাকিয়ার গুহা থেকে কিতাব (তাওরাত ও ইঞ্জিল) বের করে আনবেন এবং তাবারিয়া হ্রদ থেকে যাবুর বের করে আনবেন যা মূসা ও হারুনের

পরিবার রেখে গেছে এবং যা ফেরেস্তারা বহন করেছিলেন এবং ফলকসমূহ (পাথর ও কাঠের ফলক যেখানে ঐশী বাণী লেখা হয়েছিল) এবং মূসা (আ.)-এর লাঠি। এছাড়া মাহদী সব মানুষ থেকে জ্ঞানে ও অন্তরদৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠতর।'– ইয়ানাবিউল মুওয়াদ্দা, পৃ. ৮০১ ('দুররাতুল মাআরেফ' থেকে)

বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তিনি পুনরায় আবির্ভূত হবেন তখন তাওরাতের ওপর ভিত্তি করে তিনি ইহুদিদের প্রশ্নের জবাব দেবেন যার ফলে বিপুল সংখ্যক ইহুদি ইসলাম গ্রহণ করবে।

হারিস ইবনে মুগাইরা আনসারী বর্ণনা করেন যে, তিনি আবু আবদুল্লাহ হোসাইন ইবনে আলীকে জিজ্ঞেস করেন, 'কী নিদর্শনের ভিত্তিতে আমরা মাহদীকে চিনব?' তিনি বললেন : 'তার শান্তভাব ও ভাবগাম্ভীর্য থেকে।' আমি আবারও জিজ্ঞেস করলাম : 'কোন নিদর্শনের মাধ্যমে?' তিনি বললেন : 'নিষিদ্ধ ও অনুমোদিত বিষয়গুলোর মাধ্যমে এবং তার প্রতি মানুষের প্রয়োজনীয়তা দেখে ও অন্যদের কাছে তার প্রয়োজনীয়তা দেখে।'– ইকদুদ দুরার, তৃতীয় অধ্যায়

ইবনে হাজার তাঁর 'সাওয়ায়েক্ব'-এর ১১৪ পৃষ্ঠায় আবু মুহাম্মাদ হাসান আসকারীর মৃত্যুর কথা উল্লেখ করার পর বলেন : 'তিনি আবুল ক্বাসিম মুহাম্মাদ হুজ্জাতকে ছাড়া আর কাউকে তাঁর উত্তরাধিকারী করে যান নি যাঁর বয়স তাঁর পিতার মৃত্যুর সময় ছিল পাঁচ বছর। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে সে সময়ই প্রজ্ঞা দান করেছিলেন।'

প্রায় ৭০ বছরের সংক্ষিপ্ত গায়বাতকালে ইমাম মাহদী (আ.)-এর সরাসরি প্রতিনিধিরা বিভিন্ন বিষয়ে জনসাধারণের প্রশ্নগুলোকে ইমাম মাহদী (আ.)-এর নিকট পেশ করতেন এবং ইমাম সেগুলোর জবাব তাঁদেরকে দিতেন। এই প্রতিনিধিগণ জনসাধারণের নিকট এসব জবাব পৌঁছে দিতেন।

মহানুভবতা ও দানশীলতা

প্রতীক্ষিত ইমাম সকল মানুষের মধ্যে মহানুভব ও দানশীল হবেন। অসংখ্য রেওয়ায়াতে এসেছে যে, তিনি মানুষের মধ্যে সম্পদ এমনভাবে বণ্টন করবেন যে, একজন দরিদ্র ব্যক্তিও খুঁজে পাওয়া যাবে না এবং বিশ্বের বুকে কোন অভাবী মানুষ

পাওয়া যাবে না। অবস্থা এমন হবে যে, যদি কেউ যাকাত দিতে ইচ্ছুক হয় তাহলেও সে যাকাত নেয়ার মতো কোন লোক খুঁজে পাবে না।

আবু সাঈদ খুদরী রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন : 'নিশ্চয়ই মাহদী আমার উম্মাহ থেকে।' এরপর তিনি বলেছেন : 'একজন ব্যক্তি তার কাছে যাবে এবং বলবে 'মাহদী আমাকে দিছু দান করুন।' তখন সে তাকে সম্পদ ঢেলে দিবে এমন পরিমাণ যা সে বহন করতে পারে।"– ইবনে মাজাহ (হুদাল ইসলাম, ২৫তম সংখ্যা থেকে)

হাফেজ আবু আবদুল্লাহ নাঈম ইবনে হাম্মাদ থেকে এবং তিনি আবু রুমিয়াহ থেকে বলেন : 'মাহদী অসহায়দের খাওয়াবেন।'– ইকদুদ দুরার, তৃতীয় অধ্যায়

রাসূল (সা.) বলেছেন : 'আল্লাহ আমার বংশ থেকে এক ব্যক্তিকে নিয়োগ দিবেন, সে প্রচুর পরিমাণ সম্পদ দান করবে।'– সাওয়ায়েক্ব, পৃ. ৯৮

খাদ্য ও পোশাক

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেন : 'তার পোশাক হবে মোটা ও পুরু এবং তার খাদ্য হবে শক্ত।' একইভাবে ইমাম রেযা (আ.)-ও বলেন : 'মুহাম্মাদ (সা.)-এর বংশধর কা য়েমের পোশাক হবে মোটা ও খাদ্য হবে শুকনা।'

ধৈর্য ও সহনশীলতা

ইমাম মাহদী (আ.)-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ধৈর্য ও সহনশীলতা। অন্য সকল ইমাম যেসকল সমস্যার মোকাবিলা করেছেন ইমাম মাহদী (আ.) তার চেয়েও অধিক সমস্যা ও বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মোকাবিলা করবেন। তাঁর এ দীর্ঘ জীবনে তিনি অনেক তিক্ত ও বড় বড় মর্মান্তিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন ও করছেন।তিনি দেখছেন অমুসলিমরা কীভাবেইসলামি বিশ্বকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছে এবং মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছে।

সারা বিশ্বের মুসলমানরা, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরব, বাহরাইন, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, আফ্রিকার নাইজেরিয়া, এশিয়ার চীন, ভারত প্রভৃতি দেশে নির্যাতনের মধ্যে রয়েছে। মুসলমানদের ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন একটি সাধারণ

বিষয়ে পরিণত হয়েছে। মুসলমানদের সম্পদ অন্যরা লুটে নিয়ে যাচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম দেশগুলোর প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে হস্তক্ষেপ করছে এবং তারা তাদের মতাদর্শ মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে।

এই সকল বিপর্যয়কর অবস্থা ইমাম মাহদী (আ.)-এর চোখের সামনে ঘটছে, আর মুসলিম জাতির অভিভাবক হিসেবে ইমাম মাহদীর কাছে এ বিষয়গুলো কতটা বেদনাদায়ক! এই সবকিছুর মোকাবিলায় তিনি ধৈর্য ধারণ করে আছেন।

সাহসিকতা ও দৃঢ়তা

ইমাম মাহদী (আ.) তাঁর যুগের সবচেয়ে সাহসী ব্যক্তি ও বীর পুরুষ। শক্তিমত্তা, ক্ষমতা, সাহসিকতা তিনি মহানবী (সা.) ও অন্যান্য ইমাম থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছেন। মহানবী (সা.) যেরকম কাফির-মুশরিকদেরকে পরাজিত করে বিশ্বে ইসলাম ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তেমনি ইমাম মাহদী (আ.) খোদাদ্রোহী ওঅত্যাচারী শক্তিকে পরাজিত করে পুনরায় বিশ্বে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করবেন এবং সব ধর্মের ওপর একে বিজয়ী করবেন।

ইবনে হাজার বলেন : ইবনে হাম্মাদ একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যার বর্ণনাধারা রাসূল (সা.) পর্যন্ত পৌঁছায়। হযরত বলেছেন :'মাহদী আমার জাতি থেকে, সে আমার সুন্নাহর জন্য যুদ্ধ করবে যেভাবে আমি আল্লাহর ওহীর জন্য যুদ্ধ করেছি।'– সাওয়ায়েক্ব, পৃ. ৯৮

প্রতীক্ষিত ইমাম মাহদী (আ.) সত্যের প্রতিরক্ষায় নিরন্তর সংগ্রামরত একজন ব্যক্তিত্ব এবং অত্যাচারিত-নির্যাতিত ব্যক্তির সাহায্যে তিনি সবচেয়ে বেশি নিবেদিত। কোন প্রকার সমালোচনা তাঁকে সত্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় দমিয়ে রাখতে পারবেনা। তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের মতোই মিথ্যার মোকাবিলায় দৃঢ় ও অবিচল। যখন তিনি আবির্ভূত হবেন তখন তিনি সকল মিথ্যা, ছল-চাতুরি, প্রতারণা ও অত্যাচারের মূলোৎপাটন করবেন।

ইবাদত-বন্দেগি

অন্যান্য ইমামের মতো ইমাম মাহদী (আ.)-ও অধিকাংশ দিন রোযা রাখেন এবং রাতে নামায পড়বেন এবং মহান আল্লাহর নিকট মুনাজাতে অতিবাহিত করবেন এটিই

স্বাভাবিক। রেওয়ায়েতে ইমাম মাহদী (আ.)-এর কিছু দোয়া বর্ণিত হয়েছে যে দোয়ার মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর কাছে তাঁর আকুতির বিষয়টি ফুটে ওঠে।

ইমাম মাহদী (আ.)-এর গায়বাত সম্পর্কে তথ্য

আহ্‌লে সুন্নাতের মুহাদ্দিসগণ মহানবী (সা.)-এর তেত্রিশ জন সাহাবী থেকে ইমাম মাহ্‌দী (আ.) সংক্রান্ত হাদিস তাঁদের নিজ নিজ হাদিস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন; একশ' ছয় জন প্রসিদ্ধ সুন্নি আলেম গায়েব ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব সংক্রান্ত হাদিস নিজ নিজ গ্রন্থে সংকলন করেছেন। বত্রিশ জন প্রসিদ্ধ সুন্নি আলেম ইমাম মাহ্‌দী প্রসঙ্গে স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ বাকির (আ.) তাঁর পিতা থেকে, যিনি বর্ণনা করেন আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে যে, 'মাহদী আমার বংশ থেকে। তার জন্য একটি আত্মগোপনকাল থাকবে। যখন সে আবির্ভূত হবে তখন সে পৃথিবীকে সাম্য ও ন্যায় বিচার দিয়ে পূর্ণ করে দেবে যেমনভাবে তা নৃশংসতা ও নিপীড়নে পূর্ণ ছিল।'– ইয়া নাবিউল মুওয়াদ্দা, পৃ. ৪৪৭ (ফারায়েদুস সিমতাঈন থেকে)

হযরত আলী (আ.) তাঁর এক বক্তব্যে বলেন : 'হে জনতা! এটি হলো সময় প্রত্যেক শপথকৃত ঘটনা ঘটার এবং বিভিন্ন বিষয়ের আগমনের যা সম্পর্কে তোমরা জানো না। জেনে রাখ, আমাদের মাঝ থেকে (নবী সা.-এর পবিত্র পরিবার থেকে) সে ভবিষ্যতে আমাদের পথে চলবে একটি প্রোজ্জ্বল বাতি নিয়ে এবং নৈতিকগুণসম্পন্নদের পায়ের ছাপ অনুসরণ করবে গিঁট খোলার জন্য, দাসদের মুক্ত করার জন্য এবং বিভক্তদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য। সে জনগণের কাছ থেকে গোপন থাকবে এমনভাবে যে, কোন পায়ের ছাপ সন্ধানকারী তার পায়ের ছাপ খুঁজে পাবে না যদি সে তার পিছু নেয়।'– নাহজুল বালাগা, খুতবা নং ১৪৮

পূর্ববর্তী নবীদের বৈশিষ্ট্য

মহানবী (সা.) বলেন : মহান আল্লাহ্‌ আমাদের কায়েমের ব্যাপারে এমন তিনটি জিনিস বাস্তবায়ন করবেন যা তিনি পূর্ববর্তী তিন জন নবীর ক্ষেত্রেও বাস্তবায়িত

করেছিলেন : মূসা (আ.)-এর জন্মগ্রহণের মতোই তার জন্ম গোপন রেখেছিলেন, হযরত ঈসা (আ.)-এর অন্তর্ধানের মতো তার অন্তর্ধান এবং হযরত নূহ (আ.)-এর দীর্ঘ জীবনের মতোই তার দীর্ঘ জীবন নির্ধারণ করেছেন এবং এরপর তাঁর যোগ্য বান্দা হযরত খিযির (আ.)-এর জীবনকে তার দীর্ঘ জীবনের দলিলস্বরূপ স্থাপন করেছেন।

আমি বললাম : হে আল্লাহ্‌র রাসূলের সন্তান! এ সব বিষয় আমাদেরকে ব্যাখ্যা করে শুনান। তিনি বললেন : তবে হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মগ্রহণ সম্পর্কে : যখন ফিরআউন বুঝতে পারল যে, তার রাজত্বের ধ্বংস মূসা (আ.)-এর হাতে বাস্তবায়িত হবে, তখন সে ভবিষ্যদ্বক্তাদেরকে উপস্থিত করেছিল। তারা ফিরআউনকে হযরত মূসার বংশধারা ও জাতির ব্যাপারে পথ প্রদর্শন করে বলেছিল যে, সে বনি ইসরাইলের অন্তর্ভুক্ত হবে। ফিরআউন তার কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশ দিল যেন তারা ইসরাইল বংশীয় অন্তঃস্বত্তা মহিলাদের পেট চিঁড়ে ফেলে। আর এ নির্দেশ বাস্তবায়ন করার জন্য বিশ হাজারেরও অধিক সংখ্যক নবজাতক শিশুর শিরশ্ছেদ করা হয়। কিন্তু যেহেতু মহান আল্লাহ্ তাঁকে রক্ষা করার ইচ্ছা করেছিলেন সেহেতু তারা তাঁর নাগাল পায় নি এবং তাঁকে হত্যা করতেও সক্ষম হয় নি।

একইভাবে বনু উমাইয়্যা ও বনু আব্বাস যখন বুঝতে পারল যে, তাদের সরকারের বিলুপ্তি এবং তাদের শাসনকর্তা ও দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ব্যক্তিদের ধ্বংস কায়েম আল মাহ্‌দীর হাতে ন্যস্ত, তখন তারা আমাদের শত্রুতায় লিপ্ত হলো এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আহ্‌লে বাইতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল এবং কায়েমকে নিশ্চিতভাবে হত্যা করার আশায় মহানবীর বংশধরদেরকে হত্যা করতে লাগল। কিন্তু মহান আল্লাহ্ কোন জালেমের কাছে তাঁর প্রকৃত পরিকল্পনা ও বিষয় প্রকাশ করতে দেন নি যাতে তিনি তাঁর নূরকে পূর্ণ করতে সক্ষম হন, যদিও তা মুশরিকদের কাছে অপছন্দনীয়।

ঈসা (আ.)-এর অন্তর্ধান প্রসঙ্গে : ইহুদী ও খ্রিস্টানরা সবাই বিশ্বাস করে যে, তিনি নিহত হয়েছেন। তবে পবিত্র কোরআন তাদের অভিমত প্রত্যাখ্যান করে বলেছে : না তারা তাকে হত্যা করেছে, আর না তাকে ফাঁসী দিয়েছে; বরং তারা এ ক্ষেত্রে ভুল করেছে। (নিসা : ১৫৬)

কায়েমের অন্তর্ধানও ঠিক এমনই। কারণ, তার অন্তর্ধানকাল দীর্ঘ হবার কারণে মুসলিম উম্মাহ্ তা অস্বীকার করবে।

আর এখন নূহ (আ.)-এর আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হবার বিষয় : যখন তিনি তাঁর জাতির ওপর আকাশ থেকে আযাব প্রেরণ করার জন্য প্রার্থনা করলেন, তখন মহান আল্লাহ্ জিবরাইল (আ.)-কে সাতটি খুরমার বীজসহ তাঁর কাছে প্রেরণ করে বলতে বললেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! মহান আল্লাহ্ বলেছেন : এ জনগণ আমারই সৃষ্ট এবং আমারই দাস এবং তাদের কাছে আমার বাণী প্রচার ও দলিল পূর্ণ করা ব্যতীত তাদেরকে আমি বজ্রপাতের দ্বারা ধ্বংস করব না। অতএব, আপনি আপনার উম্মতের কাছে ফিরে যান। আর এ কারণে আমি আপনাকে প্রতিদান দেব। এ খুরমা বীজগুলো বুনে ফেলুন। এগুলো থেকে বৃক্ষ জন্মানো, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং ফলবতী হবার পর আপনি মুক্তি পাবেন। এ ব্যাপারে আপনার মুমিন অনুসারীদের সুসংবাদ দিন।

যখন খুরমা গাছগুলো জন্মালো, শাখা-প্রশাখা পত্রবিশিষ্ট হলো, গাছগুলোতে ফল ধরলো এবং দীর্ঘকাল ফল ধারণ করে রইল তখল নূহ (আ.) মহান আল্লাহ্র কাছে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করার আবেদন জানালেন। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তাঁকে পুনরায় ঐ গাছগুলোর বীজ বপন ও ধৈর্যধারণ এবং নিজের জাতির কাছে সুস্পষ্ট দলিল পেশ করার আদেশ দিলেন। এ সময় যেসব দল তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল তারা ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে জানল। ফলে তাদের মধ্য থেকে তিনশ' জন ধর্মত্যাগী হয়ে বলতে লাগল : যদি নূহের দাবি ও প্রচার সত্য হতো, তাহলে তার প্রভুর পক্ষে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা একান্ত অনুচিত হতো।

আর এভাবেই মহান আল্লাহ্ নূহ (আ.)-কে পরপর সাত বার খুরমার বীজ বপন করে সেগুলো ফলবান বৃক্ষে পরিণত করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। আর প্রতিবারই তাঁর একদল অনুসারী ধর্ম থেকে বের হয়ে আসতে থাকে, যার ফলে তাঁর সমর্থক ও অনুসারীর সংখ্যা সত্তরের সামান্য বেশি রয়ে গেল। তখনই মহান আল্লাহ্ তাঁর কাছে ওহী পাঠিয়ে বললেন : হে নূহ! মনোযোগ দিয়ে শোন। এখন রাতের আঁধার আলোকোজ্জ্বল প্রভাতে পরিণত হয়েছে। এখন ঐ সব অপবিত্র ব্যক্তির ধর্মত্যাগের মাধ্যমে সত্য অসত্য থেকে পৃথক হয়ে গেছে এবং কুফ্রের অস্বচ্ছতা থেকে ঈমানের স্বচ্ছ পানি পাতিত হয়েছে।

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : হযরত কায়েম আল মাহ্দীর অন্তর্ধানকাল এতটা দীর্ঘ হবে যে, এর ফলে সত্য পরিপূর্ণরূপে আলোকোজ্জ্বল হবে এবং আঁধার ও অবিশুদ্ধতা থেকে ঈমানের স্বচ্ছতা পবিত্র ও পৃথক হয়ে যাবে।"[১]

[১]. বিহার, ৫১তম খণ্ড, পৃ. ২১৯-২২২।

ইমাম মাহদী (আ.)-এর শাসনব্যবস্থা ও এর বৈশিষ্ট্য

ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর দায়িত্ব অত্যন্ত মহান এবং বিবিধ দিক ও উদ্দেশ্যমণ্ডিত হবে। তিনি এমন মহান পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন যা পৃথিবীর বুকে মানুষের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দেবে এবং মানব জাতির সামনে সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়ের শুভ সূচনা করবে। তিনি তাঁর যুগে এবং এর পরে বস্তুগত দৃষ্টিকোণ থেকে মানব জীবনের উন্নতি ও পূর্ণতা এমনভাবে নিশ্চিত করবেন যে, যা এর পূর্ববর্তী পর্যায়গুলো উন্নত হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোর সাথে অতুলনীয় হবে। সেই সাথে তিনি অস্তিত্বজগতের গভীরে প্রবেশ, ঊর্ধ্বজগৎ ও এর অধিবাসীদের সাথে সংযোগ স্থাপন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় অতিক্রম করার মিশনও বাস্তবায়ন করবেন যা কিয়ামত ও পুনরুত্থান দিবসে প্রবেশের ভূমিকাস্বরূপ এবং গায়েবী জগৎ ও দৃশ্যমান এ পার্থিব জগতের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র রূপে কাজ করবে। নিচে ইমাম মাহদী (আ.)-এর শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু বিষয় উল্লেখ করা হলো :

হযরত সুলায়মান ও যূলকারনাইনের সাম্রাজ্য অপেক্ষাও বিশাল সাম্রাজ্য

ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতসমূহ থেকে খুব ভালোভাবে বোঝা যায় যে, তিনি যে বিশ্ব-ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করবেন তা হযরত সুলায়মান (আ.) ও বাদশাহ যূলকারনাইনের রাজত্ব অপেক্ষাও বিশাল। কতিপয় রেওয়ায়েত থেকেও বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন ইমাম বাকির (আ.)-এর নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত : 'আমাদের (ইমাম মাহ্দীর) রাজত্ব হযরত সুলায়মান ইবনে দাউদ (আ.)-এর রাজত্বের চেয়ে ব্যাপক এবং আমাদের রাজ্যের পরিসীমা তাঁর রাজ্যের পরিসীমা অপেক্ষা বড় হবে।'– ইমাম মাহদী (আ.)-এর আত্মপ্রকাশ, পৃ. ৩৩৪

ইসাফুর রাগেবীনের লেখক ১৫২ পৃষ্ঠায় বলেছেন : 'হাদিসে এসেছে, মাহদী পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত মালিক হবেন।'

সকল ধর্মের ওপর জয় লাভ

ইমাম মাহদী (আ.) সরকার গঠনের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর ধর্মকে বিশ্বের অন্য সকল ধর্মের ওপর বিজয়ী করবেন এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ এই সত্যধর্মে প্রবেশ করবে।

'তিনিই সেই আল্লাহ্ যিনি তাঁর রাসূলকে সত্যধর্ম এবং মানুষকে পথপ্রদর্শন করার জন্য প্রেরণ করেছেন যাতে তা সব ধর্মের ওপর জয়যুক্ত ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।'[১]– এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) বলেছেন : 'মহান আল্লাহ্ কি এখন পর্যন্ত এ আয়াতের বাস্তব নমুনা প্রকাশ করেছেন? না, ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, এমন কোন জনপদ পৃথিবীর বুকে থাকবে না যেখানে সকাল-সন্ধ্যায় মহান আল্লাহ্র একত্ব এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করা হবে না।'[২]

আবু বাসীর এ আয়াত প্রসঙ্গে ইমাম সাদিক (আ.)-এর কাছে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন : 'মহান আল্লাহ্র শপথ, এ আয়াতের ব্যাখ্যা এখনো বাস্তবায়িত হয় নি।' আবু বাসির বলেন : 'আপনার জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গীকৃত হোক। এটি কখন বাস্তবায়িত হবে?' তিনি বলেন : "যখন মহান আল্লাহ্র ইচ্ছায় আল-কায়েম আল-মাহ্দী আবির্ভূত হবে ও সংগ্রাম করবে। যখন সে আবির্ভূত হবে তখন কাফির ও মুশরিকরা তার আবির্ভাব, আন্দোলন ও সংগ্রামের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়বে; কারণ, কোন পাথরের পেছনে যদি কোন কাফির বা মুশরিক লুকায় তাহলে ঐ পাথর সবাক হয়ে বলবে : 'হে মুসলমান! আমার আশ্রয়ে কাফির অথবা মুশরিক লুকিয়ে আছে; তাকে হত্যা কর।' আর সেও তখন তাকে হত্যা করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।"[৩]

কোরআন ও সুন্নাহর শাসন ব্যবস্থা

ইমাম মাহদী (আ.)-এর আইন ও রাজনৈতিক দর্শন ইসলাম ও কোরআনের স্বর্ণালি শিক্ষা অনুযায়ী হবে। ইমাম আলী (আ.) বলেছেন : 'অন্যেরা যখন পবিত্র কোরআনকে নিজেদের ধ্যান-ধারণা, অভিরুচি ও বিশ্বাসের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে (অর্থাৎ নিজেদের অভিরুচির ভিত্তিতে অপব্যাখ্যা করবে) তখন সে পবিত্র কোরআন থেকে তার আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করবে। সে বিশ্ববাসীকে ন্যায়প্রক্রিয়া কীভাবে অবলম্বন করতে হয় তা বাস্তবে দেখাবে এবং কিতাব (কোরআন) ও সুন্নাহ্– যেসবকে পরিত্যাগ ও কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে সেসবকে পুনরুজ্জীবিত করবে।'[৪]

---

[১]. সূরা তাওবাহ্ : ৩৩।
[২]. বাহরানী প্রণীত আল মাহাজ্জাহ্, পৃ. ৮৬।
[৩]. বাহরানী প্রণীত আল মাহাজ্জাহ্, পৃ. ৮৬।
[৪]. শারহু নাহজিল বালাগাহ্, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬।

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেছেন : 'মহান আল্লাহ্ তার মাধ্যমে সব ধরনের বিদআত দূর করবেন, প্রতিটি পথভ্রষ্টতাকে মিটিয়ে দেবেন এবং প্রতিটি সুন্নাহ্কে পুনরুজ্জীবিত করবেন।'[১]

শাসকদের প্রতি কঠোরতা

'ইকদুদ দুরার' এর লেখক ৮ম অধ্যায়ে তাউস থেকে বর্ণনা করেন, 'মাহদীর নিদর্শন হচ্ছে তিনি শাসকদের প্রতি কঠোর হবেন এবং জনগণের প্রতি উদার হবেন সম্পদ বণ্টনে এবং অসহায়দের পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়াতে নরম হবেন।'– ফাতান, আবু আবদুল্লাহ নাঈম ইবনে হাম্মাদ

ন্যায়বিচার

কোন রকম বৈষম্য ছাড়াই সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হবে। যেখানে আইনের চোখে সকলে সমান এই তত্ত্বকে বাস্তব এবং ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ করা হবে।

আলী (আ.) থেকে বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : 'যদি পৃথিবীর জীবন আর একদিনও বাকী না থাকে আল্লাহ আমার বংশ থেকে এক ব্যক্তিকে নিয়োগ দিবেন। সে পৃথিবীকে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার দিয়ে পূর্ণ করে দেবে যেভাবে তা নৃশংসতা ও নিপীড়নে পূর্ণ ছিল।'– সহীহ আবু দাউদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৭

ইমাম মাহদী (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 'ফুতুহাতুল মাক্কীয়াহ'র লেখক ৩৬৩ নং অধ্যায়ে লিখেছেন : 'তিনি সম্পদ সমানভাবে বণ্টন করবেন, জনগণের মাঝে ন্যায়বিচার করবেন এবং ঝগড়া বিবাদকে বন্ধ করবেন।'

পাপীদের শাস্তি প্রদান

ইমাম মাহদী (আ.) পাপীদেরকে যথোপযুক্ত শাস্তি দেবেন। পবিত্র কোরআনের 'সেদিন অসৎকর্মশীল ব্যক্তিরা নিজেদের চেহারা ও মুখমণ্ডলের দ্বারা চিহ্নিত হবে। অতঃপর...'– এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম জাফর আস-সাদিক (আ.) থেকে বর্ণিত

[১]. আল কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১২।

হয়েছে : 'মহান আল্লাহ্ তাদেরকে সব সময় চেনেন। তবে উপরিউক্ত আয়াত আল-কায়েম আল-মাহ্দীর শানে অবতীর্ণ হয়েছে। সে পাপীদেরকে তাদের চেহারা ও মুখমণ্ডলের দ্বারা চিনবে এবং সে ও তার সাথিরা তরবারি দিয়ে তাদেরকে শাস্তি দেয়ার মতো শাস্তি দেবে।'[১]

মুসলিম উম্মাহ্র নেয়ামতের অধিকারী হওয়া

ইমাম মাহদী (আ.)-এর সময়কালে পৃথিবীবাসীর প্রতি মহান আল্লাহর অবারিত রহমত বর্ষিত হবে। মহানবী (সা.) বলেছেন : 'মাহ্দীর যুগে আমার উম্মত এমন নেয়ামত লাভ করবে যে, তারা পূর্বে কখনই তা লাভ করে নি। আকাশ থেকে তাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং তখন পৃথিবীর বুকে সব ধরনের উদ্ভিদই জন্মাবে।'[২]

মহানবী (সা.) আরো বলেছেন : "আসমান ও যমীনের বাসিন্দারা তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে। আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করার ব্যাপারে কার্পণ্য করবে না এবং যমীনেও উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও তরুলতা জন্মানোর পথে কোন বাধা থাকবে না অর্থাৎ পৃথিবী বৃক্ষ, তরুলতা, ফুলে-ফলে ভরে যাবে। এর ফলে জীবিতরা আকাঙ্ক্ষা করতে থাকবে : হায়, যদি এসব নেয়ামত ভোগ করার জন্য মৃতরা জীবিত হতো!"[৩]

সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত হয়েছে : "যে বছর আল-কায়েম আল-মাহ্দী আবির্ভূত হবেন এবং কিয়াম করবেন সে বছর চব্বিশ বার পৃথিবীর ওপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হবে যার বরকত ও কল্যাণকর প্রভাব সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হবে।"[৪]

ভূ-গর্ভস্থ সম্পদ উত্তোলন এবং জনগণের মাঝে তা বণ্টন

মহানবী (সা.) বলেছেন : 'পৃথিবী তার জন্য এর সমুদয় সম্পদ ও ঐশ্বর্য বের করে দেবে এবং সে জনগণের মধ্যে অগণিত ধন-সম্পদ বণ্টন করবে।'[৫]

---

১. নুমানী প্রণীত গাইবাত, পৃ. ১২৭।
২. ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৯৮।
৩. ইবনে হাম্মাদের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৯৯।
৪. কাশফুল গাম্মাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫০।
৫. বিহার, ৫১তম খণ্ড, পৃ. ৬৮।

রাসূল (সা.) বলেন : 'মাহদী আমার বংশ থেকে।' এরপর তিনি বলেন : 'আকাশের বাসিন্দারা এবং পৃথিবীর বাসিন্দারা তার শাসন নিয়ে খুশি।'– সাওয়ায়েক্ব, পৃ. ৯৮

নবী (সা.) বলেন : 'সুসংবাদ তোমাদেরকে মাহদী সম্পর্কে।' এরপর তিনি বলেন : 'আকাশের বাসিন্দারা এবং পৃথিবীর বাসিন্দারা তাকে নিয়ে খুশি। সে সম্পদ সমানভাবে ভাগ করে দেবে, মুহাম্মাদের উম্মাহকে অভাব থেকে মুক্তি দেবে এবং তাদেরকে তার সৎকর্মশীলতা দিয়ে আরাম দেবে।"– ইসাফুর রাগেবীন, পৃ. ১৫১

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণের পরিবর্তন

ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতসমূহে অতীত ও বর্তমান প্রজন্মসমূহের বহু অস্বাভাবিক বিষয় আলোচিত হয়েছে। যেমন : গণযোগাযোগের মাধ্যমসমূহ, গবেষণা কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, অডিও-ভিজুয়াল সামগ্রীসমূহ, বিভিন্ন প্রকার অস্ত্র, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ, সরকার ও প্রশাসন, বিচার-ব্যবস্থা এবং আরো অন্যান্য বিষয় যেগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি আবার বাহ্যত কারামত বা মুজিযাস্বরূপ।

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : "জ্ঞান সাতাশটি অক্ষর (শাখা-প্রশাখা) সমতুল্য। সকল নবী-রাসূল সম্মিলিতভাবে যা এনেছেন তা আসলে জ্ঞানের দু'টি অক্ষরস্বরূপ। মানবজাতি মাহ্দীর আবির্ভাবের দিবস পর্যন্ত এ দু'টি অক্ষরের বেশি কিছু জানতে পারবে না। আর যখন আল-কায়েম আল-মাহদী আবির্ভূত হবে ও কিয়াম করবে তখন সে জ্ঞানের অবশিষ্ট পঁচিশটি অক্ষর বের করে তা মানবজাতির মধ্যে প্রচার করবে; আর এভাবে সে জ্ঞানের সাতাশ ভাগই প্রচার করবে ও জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেবে।"[১]

ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : 'আল-কায়েমের যুগে প্রাচ্যে বসবাসরত মুমিন ব্যক্তি পাশ্চাত্যে অবস্থানকারী নিজ ভাইকে দেখতে পাবে এবং যে ব্যক্তি পাশ্চাত্যে আছে সেও প্রাচ্যে বসবাসরত তার ভাইকে দেখতে পাবে।'[২]

---

[১]. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ৩৬৬।
[২]. বিহার, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ৩৯১।

ইমাম সাদিক (আ.) আরো বলেছেন : "যখন আল-কায়েম আবির্ভূত হয়ে বিপ্লব করবে তখন মহান আল্লাহ্ আমাদের অনুসারীদের চোখ ও কান এতটা শক্তিশালী করে দেবেন যে, তাদের ও ইমামের মাঝে কোন মধ্যবর্তী মাধ্যম ও দূত বিদ্যমান থাকবে না। এটা এমনভাবে হবে যে, ইমাম যখনই তাদের সাথে কথা বলবে, তারা তা শুনতে পাবে এবং তাকে দেখতেও পাবে। অথচ ইমাম তার নিজ জায়গাতেই থাকবে।"[১]

মাহদী (আ.)-এর আগমনের নিদর্শনসমূহ

'ফুসুলুল মুহিম্মা'-র লেখক ১২তম অধ্যায়ে বলেন- হাদিসসমূহে এসেছে মাহদীর আবির্ভাব ও ঘটনাসমূহ সম্পর্কে যা তার উত্থানের আগে ঘটবে এবং প্রমাণ সম্পর্কে যা তার আবির্ভাবের আগে আবিষ্কৃত হবে। যেমন-

১. সুফিয়ানীর বিদ্রোহ।
২. হাসানী-র হত্যাকাণ্ড।
৩. বনি আব্বাসের মাঝে সাম্রাজ্য নিয়ে দ্বন্দ্ব।
৪. মধ্য রমযানে সূর্যগ্রহণ।
৫. চন্দ্রগ্রহণ রমযানের শেষে যা জ্যোর্তিবিজ্ঞানের হিসাব বিরোধী।
৬. পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠবে।
৭. ৭০ জন ধার্মিক ব্যক্তিকে হত্যা।
৮. হত্যাকাণ্ড।
৯. কুফার মসজিদের দেয়াল ধ্বংস হওয়া।
১০. খোরাসান থেকে কালো পতাকাবাহীদের অগ্রসর হওয়া।
১১. ইয়ামানীর উত্থান।
১২. মিশরে মাগরেবীদের বিদ্রোহ এবং সিরিয়ায় গিয়ে ক্ষমতা দখল।
১৩. তুর্কীদের একটি দ্বীপে অবতরণ।
১৪. রামাল্লাহতে (ফিলিস্তীনে) রোমানদের আগমন।

---

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬।

১৫. পূর্ব দিকে একটি নক্ষত্র উঠবে যা চাঁদের মত জ্বলজ্বলে।

১৬. চাঁদটি দু'টুকরো হয়ে পরস্পর নিকটবর্তী থাকবে।

১৭. আকাশে একটি লাল আভা দেখা যাবে।

১৮. একটি আগুন দেখা যাবে পূর্ব দিকে এবং তিন দিন অথবা সাত দিন থাকবে।

১৯. আরবরা তাদের লাগাম ছেড়ে দিবে।

২০. আরবরা শহরসমূহের মালিক হবে।

২১. আরবরা ইরানীদের শাসন থেকে বেরিয়ে আসবে।

২২. মিশরের অধিবাসীরা তাদের শাসককে হত্যা করবে।

২৩. সিরিয়া ধ্বংস হবে এবং তিনটি পতাকা এর দিকে অগ্রসর হবে।

২৪. ক্বায়েম ও আরবের পতাকা মিশরের দিকে অগ্রসর হবে।

২৫. খোরাসানের দিকে খোদাই করা পতাকা অগ্রসর হবে।

২৬. কিছু আরব হীরাহর উপকণ্ঠে পৌঁছাবে।

২৭. পূর্বদিক থেকে কালো পতাকা আসবে।

২৮. ফোরাত নদীতে একটি ফাটল দেখা দিবে যার কারণে কুফার রাস্তায় পানি বইবে।

২৯. ষাটজন মিথ্যাবাদী আবির্ভূত হবে এবং প্রত্যেকেই নিজেকে নবী বলে দাবি করবে।

৩০. আবু তালিবের বংশধর থেকে বারোজন বিদ্রোহ করবে এবং প্রত্যেকেই নিজেকে ইমাম দাবি করবে।

৩১. বনি আব্বাসের একজন মর্যাদাবান ব্যক্তি বাগদাদের কাছে কার্ক সেতুর কাছে পানিতে ডুবে মারা যাবে।

৩২. একটি কালো বাতাস বাগদাদে বইবে।

৩৩. বাগদাদে একটি ভূমিকম্প হবে এতে এর বেশির ভাগ অংশই ধূলিস্মাৎ হয়ে যাবে।

৩৪. ইরাকের অধিবাসীদেরকে ভয় আঁকড়ে ধরবে।

৩৫. ইরাকের লোকদের মৃত্যু দ্রুত ধরে ফেলবে।

৩৬. ইরাকের লোকেরা সম্পদ ও ফলের অভাবে পড়বে।

৩৭. তারা চারাগাছ ও গুড়ো খাদ্যের দিকে আকৃষ্ট হবে।

৩৮. জনগণের কৃষি উৎপাদন হবে অত্যন্ত কম।

৩৯. অনারবদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিবে এবং তারা পরস্পরের রক্ত ঝরাবে।

৪০. দাসরা তাদের প্রভূদের অবাধ্য হবে ও তাদেরকে হত্যা করবে।

৪১. এরপর চব্বিশবার বৃষ্টি হবে। পৃথিবীর মাটি এর মৃত্যুর পর আবার জীবিত হবে এবং এর সম্পদ উগড়ে দিবে। তখন সব ধরনের দূর্যোগ মাহদীর প্রতি বিশ্বাসীদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হবে। তখন তারা বুঝতে পারবে মাহদী মক্কায় আবির্ভূত হয়েছেন। ফলে তারা মক্কার দিকে অগ্রসর হবে তাকে সাহায্য করার জন্য।

এসব ঘটনার কিছু অবশ্যই ঘটবে আর কিছু শর্তসাপেক্ষে ঘটতে পারে।

মাহদাভীয়াত

কিয়ামতের আগে পৃথিবী যখন অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারে পূর্ণ হয়ে যাবে তখন এক মহান ব্যক্তি মানবের মাঝে আবির্ভূত হবেন। তিনি সকল অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন। তিনি সকল অপশক্তিকে পরাজিত করে পৃথিবীতে একটি তাওহীদবাদী ন্যায়পরায়ণ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবেন। এই সংক্রান্ত বিশ্বাসই মাহদাভীয়াত।

যেহেতু এসকল কর্ম সম্পাদনকারী মহান ব্যক্তির উপাধি 'মাহদী', সেহেতু এই সংক্রান্ত বিশ্বাস 'মাহদাভীয়াত' নামে অভিহিত হয়েছে।

মাহদাভীয়াত কেবল শিয়া ইসলামের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামের সকল শাখা স্বীকার করে যে, এ বিশ্বের পরিসমাপ্তি হবে ইমাম মাহদী (আ.) কর্তৃক একটি ন্যায়বিচারমূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর। এ প্রসঙ্গে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নিকট থেকে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তাই এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তবে শিয়াদের ক্ষেত্রে একটি সুবিধা রয়েছে যে, মাহদাভীয়াত শিয়াদের কাছে অস্পষ্ট কোন বিষয় নয়। আহলে বাইতের মাযহাবে এই মহান ব্যক্তি ইমাম মাহদী নামে পরিচিত, যিনি ইমামিয়া বিশ্বাসীদের দ্বাদশ ইমাম। আমরা তাঁর

বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানি। আমরা তাঁর পূর্বসূরি ও তাঁর পরিবার সম্পর্কে জানি। আমরা জানি তিনি কখন জন্ম গ্রহণ করেছেন। মহান আল্লাহ তাঁকে একটি দীর্ঘ জীবন দান করেছেন। তাঁর অলৌকিক কর্মকাণ্ড ও তাঁর সাথে যাঁরা সম্পৃক্ত ছিলেন তাঁদের সম্পর্কে আমরা জানি। আমরা তাঁর সম্পর্কে বিশদ জানি। আর এই অবগতি শুধু শিয়া বর্ণনকারীদের বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে নয়, অন্যান্য মাযহাবের বর্ণনাকারিগণও তা বর্ণনা করেছেন।

'মাহদাভীয়াত ধর্মের প্রধান বিষয়গুলোর অন্যতম। এটি নবুওয়াতের সাথে তুলনীয়; তাই নবুওয়াতের মতোই গুরুত্ব দেয়া উচিত। কারণ, মাহদাভীয়াত সকল নবী-রাসূল প্রেরণের কারণটি উপস্থাপন করে। আর সেটি হলো মহান আল্লাহ মানব জাতিকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তার মাধ্যমে ন্যায়ের ভিত্তিতে একটি তাওহীদবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। এই যুগটি আসবে ইমাম মাহদী (আ.)-এর পুনরাবির্ভাবের পর– যে যুগে মানব জীবনের সর্বত্র তাওহীদ ও সত্যিকার আধ্যাত্মিকতা প্রাধান্য লাভ করবে, যে যুগে সত্যিকার ন্যায়বিচার কায়েম হবে। আর নবী-রাসূলগণকে এ কাজের জন্যই প্রেরণ করা হয়েছিল।'

'যদি মাহদাভীয়াতের অস্তিত্ব না থাকত, তাহলে সকল নবী-রাসূল, সকল নবুওয়াতি মিশন এবং নবী-রাসূলগণের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতো। তাই মাহদাভীয়াতের বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।'– রাহবার সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর ভাষণ থেকে

মাহদাভীয়াতের বিষয়ে সুন্নি মুসলিমরা, এমনকি অমুসলিম পণ্ডিতরা যাঁরা শিয়া মাযহাবের মাহদাভীয়াত সম্পর্কে গবেষণা করেছেন তাঁরা দেখেছেন যে, তাওরাত, বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে মাহদাভীয়াত সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা শিয়া মাযহাবের মাহদাভীয়াতের ধারণার অনুরূপ।

প্রতীক্ষা

আহলে বাইতের মাযহাবে মাহদাভীয়াতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ইমাম মাহদীর জন্য প্রতীক্ষা। প্রতীক্ষা অর্থ অবশ্যম্ভাবী কোন ঘটনার জন্য অপেক্ষা। প্রতীক্ষাকে মুক্তির জন্য অপেক্ষা করা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মুক্তি অর্থ কী? এর অর্থ নিরাপদ হওয়া। কখন আমরা সাধারণভাবে মুক্তি কামনা করি? যখন আমরা

কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে থাকি এবং কোন সমস্যায় জর্জরিত হই। যখন আমরা সমস্যার সম্মুখীন হই তখন আমাদের সমাধানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কোন ব্যক্তি সমাধাণের পথ বাতলে দেন।

আমরা এমন একজনের অপেক্ষায় রয়েছি যিনি নিজে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। আমরা এমন কারো প্রতীক্ষায় নেই যিনি জন্মগ্রহণ করেন নি। আমরা প্রতীক্ষারত এমন একজনের জন্য যিনি অস্তিত্বে রয়েছেন এবং আমাদের মধ্যেই অবস্থান করছেন। এমন রেওয়ায়াত রয়েছে যে, মানুষজন তাঁকে দেখতে পাবে, কিন্তু চিনতে পারবে না। কোন কোন রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে যে, তাঁর অবস্থা ইউসুফ (আ.)-এর মতো যাঁর ভাইয়েরা তাঁকে দেখত। তিনি তাঁর ভাইদের সাথেই ছিলেন এবং তিনি তাদের পাশে বসতেন, কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে না। এটি একটি স্পষ্ট ও অনুপ্রেরণাদায়ক সত্য।

এই রকম প্রতীক্ষা মানুষের কাঁধে দায়িত্ব অর্পণ করে। যখন একজন নিশ্চিত হয় যে, সামনে এমন একটি ভবিষ্যৎ রয়েছে, তাহলে সে এর জন্য প্রস্তুত হবে। যেমনটি পবিত্র কোরআন বলছে :

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنۢ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّٰلِحُونَ ﴿١٠٥﴾

'আমি উপদেশের (তাওরাতের) পর যাবুরে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দারাই অবশেষে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে।'– সূরা আম্বিয়া : ১০৫

আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দাগণ এই আয়াতের মর্মার্থ বুঝতে পারে। তারা এ আয়াতকে বুকে ধারণ করে প্রস্তুতি নেয়। প্রতীক্ষা মানেই নিজেদেরকে প্রস্তুত করা। আমরা বলতে পারি না যে, এই ঘটনা কয়েক বছরের মধ্যে ঘটবে না আবার এও বলতে পারি না যে, খুব শীঘ্র তা ঘটবে। আমাদেরকে সর্বাবস্থায় প্রস্তুতি গ্রহণপূর্বক প্রতীক্ষা করতে হবে। যারা প্রতীক্ষা করছে তাদেরকে ইমাম মাহদী (আ.)–এর আগমনকালে যেসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে সেগুলোর নিকটবর্তী হতে হবে। সত্যপন্থী, সাহসী, ইবাদতগুজার, আত্মিক পরিশুদ্ধতা– যা যা প্রয়োজন প্রতীক্ষারতদেরকে তা অর্জন করতে হবে। আমাদেরকে ন্যায়ের সাথে পরিচিত হতে হবে। আমাদেরকে সত্য মেনে নেয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। আমরা যেন আমাদের বর্তমান অবস্থায় এবং যে অগ্রগতি আমরা অর্জন করেছি তাতে সন্তুষ্ট না হই।

আমাদেরকে প্রতিনিয়ত অধিকতর অগ্রগতি অর্জন করতে হবে এবং আধ্যাত্মিক চরিত্র অর্জন করতে হবে।

একজন ত্রাণকর্তার জন্য অপেক্ষা করার প্রকৃত অর্থ হলো আহলে বাইতের মাযহাবে বিশ্বাসিগণ বর্তমান বিশ্বের সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করবে। তারা এই সমস্যাগুলোর সমাধানের প্রত্যাশী এবং সেই লক্ষ্যে কর্মসূচি তৈরি করে ও কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই বিষয়টি কেবল ব্যক্তিগত সমস্যাকেন্দ্রিক নয়, সামষ্টিক। যামানার ইমাম পুরো মানব জাতির সমস্যার সমাধানের জন্য আসবেন। তিনি মানব জাতিকে চিরকালের জন্য রক্ষা করতে আসবেন।

ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের জন্য অপেক্ষমাণরা বিশ্বের বর্তমান অবস্থায় অসন্তুষ্ট, ক্ষুব্ধ– যেখানে অনেক নিরীহ মানুষ অত্যাচারের শিকার, অনেকে বিপথগামী, অনেক মানুষ আল্লাহর ইবাদতের সুযোগ থেকে বঞ্চিত, বিশ্বে দুই বিলিয়ন মানুষ ক্ষুধার্ত, কোটি কোটি মানুষ খোদাদ্রোহী শক্তির শাসনের নাগপাশে বন্দি, মুমিন-মুসলিমরা অত্যাচারীদের চাপে পিষ্ট। তারা এ অবস্থার পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষী। ইমাম মাহদীর আগমনের জন্য প্রতীক্ষার অর্থ হলো বিশ্বের এই অবস্থার বিরোধিতা করা যা মানবজীবনকে সংকটাপূর্ণ করে তুলেছে। এটিই ইমাম মাহদীর জন্য সত্যিকার অপেক্ষা। আমরা 'দোয়ায়ে ইফতিতাহ' এর মধ্যে মহান আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনাই করি :

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيْ دَوْلَةٍ كَرِيْمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الإِسْلَامَ وَ أَهْلَهُ وَ تُزِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَ أَهْلَهُ وَ تَجْعَلُنَا فِيْهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَى طَاعَتِكَ وَ الْقَادَةِ إِلَى سَبِيْلِكَ وَ تَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ

'হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমরা আপনার কাছে আন্তরিকভাবে আকাঙ্ক্ষা করি একটি সম্মানপূর্ণ সরকারের বিষয়ে– যার মাধ্যমে আপনি ইসলাম ও এর অনুসারীদেরকে শক্তিশালী করবেন এবং কপটতা ও এর অনুসারীদের অপমানিত করবেন এবং আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করবেন যারা মানুষকে আহ্বান করে আপনার আনুগত্যের দিকে এবং যারা তাদেরকে পথ দেখায় আপনার অনুমোদিত পথের দিকে; আর আমাদেরকে এর মাধ্যমে দান করুন এ দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ।'

আজ আমরা মনে-প্রাণে একজন মুক্তিদাতার অপেক্ষায় রয়েছি। আমরা একজন শক্তিমান ও সাহসী মুক্তিদাতার অপেক্ষায় রয়েছি যিনি বিশ্বে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন

এবং সকল অন্যায় ও অত্যাচারকে দূর করবেন। সকল বিবেকসম্পন্ন মানুষই সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে সেই দিনটিকে কামনা করে।

ইমাম মাহদী (আ.)-এর জন্য অপেক্ষার অর্থ হলো বর্তমান অবস্থাকে মেনে না নিয়ে একটি আদর্শ জীবন যাপনের জন্য প্রচেষ্টা চালানো। আর সেই আদর্শ জীবন যাপন কেবল ইমাম মাহদী (আ.)-এর মাধ্যমেই সম্ভব। আমাদের উচিত সেই অবস্থা তৈরির জন্য একজন যোদ্ধার মতো প্রস্তুত থাকা। অলস বসে থাকার নাম অপেক্ষা করা নয়। অপেক্ষা করা মানে অন্যদের ওপর সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে কোন কিছু ঘটার জন্য বসে থাকা নয়। আমাদেরকে উচিত ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে প্রস্তুত হওয়া।

মাহদাভীয়াতের বিষয়ে সতর্কতা

স্বার্থান্বেষী কিছু মানুষ কর্তৃক এই মাহদাভীয়াতের বিষয়টিকে অপব্যবহার করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। ইমাম মাহদী (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ, তাঁর সাথে কথা-বার্তা বলা বা তাঁর পেছনে নামায পড়া ইত্যাদি বিষয় অতীতেও যেমন ছড়ানো হয়েছে, বর্তমানে তা ছড়ানো হচ্ছে। অনেক সময় এও বলা হয় যে, কেউ কেউ ইমাম মাহদী (আ.)-এর নিকট থেকে বিভিন্ন নির্দেশনাও পেয়ে থাকে। এসকল দাবি সরল মনের মানুষদেরকে বিপদে ফেলতে পারে। আমাদের জানা থাকা প্রয়োজন যে, এগুলোর ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান খুব সহজ বিষয় নয়। যদিও এটি অসম্ভব নয় যে, কেউ এমন সৌভাগ্য লাভ করে থাকতে পারেন, কিন্তু তিনি কখনও এমন দাবি করবেন না। তিনি কখনও অশ্লীল কথা বলবেন না, আলেমদের প্রতি অসম্মানসূচক কথা বলবেন না, উদ্ধত আচরণ করবেন না। অনেক সময় স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী অথবা মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তি কর্তৃক কিছু দাবি করা হতে পারে, অথবা বিশ্বব্যাপী প্রকৃত ইসলামকে নিয়ে ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে কোন কিছু দাবি করা হতে পারে। আর একারণেই প্রতিটি মুসলমানের এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত জরুরি।

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি

১. কে ইমাম মাহদী, সাইয়্যেদ সাদরুদ্দীন আল সাদর, ওয়াইজম্যান পাবলিকেশন।
২. ইমাম মাহদী (আ.)-এর আত্মপ্রকাশ, আল্লামা আলী আল কুরানী, প্রকাশক ড. জহির উদ্দিন মাহমুদ।
৩. বিভিন্ন উপলক্ষে রাহবার সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী প্রদত্ত ভাষণ।

ইসলাম ও আধুনিকতাবাদ

ডক্টর আবদুল হোসাইন খসরুপানাহ

ইসলাম ও আধুনিকতাবাদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের পূর্বে ইসলাম ও আধুনিকতাকে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন। ইসলাম বলতে আমরা এখানে ঐ ধর্মকে বোঝাচ্ছি যা এমন এক গ্রন্থে (কোরআন) এসেছে যার শব্দাবলি, বাক্যসমূহ ও বিষয়বস্তু মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মহানবী (সা.)-এর অন্তঃকরণে অবতীর্ণ হয়েছে ও তাঁর মাধ্যমে তা নির্ভুলভাবে মানুষের হাতে পৌঁছছে এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত নির্ভুল একদল ব্যক্তির দ্বারা এ ঐশী গ্রন্থের সার্বিক ও অস্পষ্ট আয়াতগুলোর খুঁটিনাটি দিকসমূহ ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপিত হয়েছে। এ ধর্মের বিষয়বস্তু বস্তুগত-অবস্তুগত, পার্থিব-পারলৌকিক, আধ্যাত্মিক-বৈষয়িক সকল কিছুকে শামিল করে। এটি একদিকে যেমন মানুষের সাথে আল্লাহর সম্পর্কের পদ্ধতি শিক্ষা দেয়, তেমনি মানুষের সাথে মানুষের ও প্রকৃতির সম্পর্কের ধরনও আমাদের শিক্ষা দান করে। ইসলাম পবিত্র কোরআন, সুন্নাত, বুদ্ধিবৃত্তি ও অভিজ্ঞতাকে মানুষের জীবনে প্রামাণ্য জ্ঞান করে এবং মানুষকে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করতে ও চিন্তাশীল হতে উদ্বুদ্ধ করে। ইসলাম যেসব মানুষ মানবোচিত কাজ করে না, বিবেক-বুদ্ধি খাটায় না ও সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না তাদেরকে পশুর থেকে অধম মনে করে।

আর আধুনিকতাবাদ হল এক প্রকার মতাদর্শ এবং আধুনিকতাবাদী এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যে এরূপ বিশ্বাস রাখে যে, পাশ্চাত্যে রেনেসাঁর পরে সৃষ্ট অবস্থা এক চরম বাস্তবতা ও আবশ্যক বিষয় এবং নিঃসন্দেহে তা মানবজাতির জন্য কল্যাণকর ও উপকারী হিসাবে কাঙ্ক্ষিত। যেহেতু তা কাঙ্ক্ষিত ও সকলের জন্য উপযুক্ত সেহেতু ঐ সমাজে সৃষ্ট অবস্থা ও উদ্ভূত তত্ত্বগুলোকে অন্য সমাজগুলোতেও সৃষ্টি ও বাস্তবায়ন করা বাঞ্ছনীয়। আধুনিকায়ন হল একটি প্রক্রিয়া যার উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা, সরকার ও সমাজকে পাশ্চাত্যের আধুনিক তত্ত্ব, নীতিমালা ও কর্মসূচির মডেলে সাজানো।

কয়েক দশক হল আধুনিকতাবাদের মধ্যে বিদ্যমান অসংলগ্নতা ও ত্রুটির প্রতিক্রিয়ায় নব্যআধুনিকতাবাদের জন্ম হয়েছে। নিঃসন্দেহে বলা যায় আধুনিকতাবাদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির ওপর অতিরিক্ত গুরুত্বারোপের ফলশ্রুতিতে এ চিন্তাধারার উৎপত্তি ঘটেছে। যদিও নব্য আধুনিকতাবাদের একক কোন সংজ্ঞা প্রদান কষ্টকর, কিন্তু কেউ কেউ এর সংজ্ঞায় বলেছেন : নব্যআধুনিকতাবাদ আধুনিকতাবাদী দর্শন ও এর পটভূমি প্রস্তুততকারী ধারণার প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট এক জটিল মতাদর্শ যার সাথে আধুনিককতাবাদের অনেক ক্ষেত্রেই বৈপরীত্য রয়েছে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভাববাদকে গ্রহণ এবং নিশ্চিত ও বাস্তব জ্ঞানের সম্ভাবনাকে নাকচ অর্থাৎ বস্তুবাদী দর্শন বা রিয়ালিজমকে অস্বীকার নব্যআধুনিকতাবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নব্য আধুনিকতাবাদ সার্বিক ও অকাট্য সত্য হিসাবে কোন কিছুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। নব্যআধুনিকতাবাদীদের দৃষ্টিতে বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন কোন বিশ্বাস ও চিরন্তন সত্য বলে কিছু নেই। কারণ, সকল বুদ্ধিবৃত্তির কাছে সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য কোন মানদণ্ড নেই। তাই অসংখ্য মত ও বিশ্বাসের সমান্তরাল উপস্থিতিকে স্বীকার করে নিতে হবে। এধরনের মতবাদ চিন্তার নিরঙ্কুশ আপেক্ষিকতায় বিশ্বাসী।

এখন প্রশ্ন হল ইসলাম কি এ দুই মতবাদের সমর্থক না পরিপন্থী। এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য এটা জানা নয় যে, ইসলামের সাথে নতুন শিল্প ও প্রযুক্তির সমন্বয় সম্ভব (গ্রহণ বা বর্জন কোনটি সঠিক) কি না? বরং উদ্দেশ্য হল আধুনিকতাবাদের পশ্চাতে নিহিত চিন্তাগত ভিত্তি, তত্ত্ব ও গঠনকারী উপাদানসমূহের ওপর পর্যালোচনা। আধুনিকতাবাদের কিছু বিষয় অবশ্যই ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক, যেমন নিউটনের তত্ত্ব উৎসারিত এ ধারণা যে, বিশ্ব যান্ত্রিকভাবে স্বয়ংক্রিয় অবস্থায় পরিচালিত হচ্ছে, এর পেছনে অলৌকিক কোন হাত থাকার প্রয়োজন নেই। নিউটনের তত্ত্ব অনুযায়ী বিশ্বের জন্য স্রষ্টার প্রয়োজন থাকলেও একে পরিচালনার জন্য কোন পরিচালকের প্রয়োজন নেই। এভাবে তিনি বিশ্বজগতের স্রষ্টাকে একজন ঘড়ি নির্মাতার সাথে তুলনা করেন যিনি তা নির্মাণের সময় চাবি দিয়ে দিয়েছেন এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা চলতে থাকবে। বিশ্বজগতকে তিনি স্রষ্টা থেকে বিচ্ছিন্ন সত্তা হিসাবে কল্পনা করেছেন।[১] পূর্বে ইহুদিরাও নিউটনের মত বিশ্বাস পোষণ করত এবং বলত যে,

১. অথচ ইসলামের চিন্তাধারায় স্রষ্টার সাথে বিশ্বের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য এক সম্পর্ক এবং সৃষ্টিজগৎ সত্তাগতভাবে প্রতি মুহূর্তে স্রষ্টার ওপর নির্ভরশীল এক অস্তিত্ব। কেননা, তা এক সম্ভাব্য অস্তিত্ব যা নিজে থেকে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে এবং কখনই স্বনির্ভর অস্তিত্বে পরিণত হতে পারে না। বরং

আল্লাহ ছয় দিনে বিশ্বকে সৃষ্টি করে সপ্তম দিনে বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন। মহান আল্লাহ তাদের এরূপ বিশ্বাসের তীব্র সমালোচনা করেছেন। কারণ, এরূপ বিশ্বাস আল্লাহর রুবুবিয়াত বা প্রতিপালক হওয়ার বিশ্বাসের পরিপন্থী ও তাঁকে অক্ষম এক সত্তা হওয়ার বিশ্বাসে পর্যবসিত হয়।

পাশ্চাত্যে ডারউইন উপস্থাপিত বিবর্তনবাদ তত্ত্বটি এধরনের বৈপরীত্যের অপর একটি নমূনা যা একটি অপ্রমাণিত তত্ত্ব মাত্র যার বিপরীতে বিভিন্ন বিজ্ঞানী ভিন্নরূপ মত দিয়েছেন। অথচ এ তত্ত্বটি সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতিসহ মানবিকবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় (এমনকি নীতিবিজ্ঞান বিষয়ক) অনেক মতবাদের মৌলিক ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে। এ তত্তটিকে মেনে নিলে ন্যায় প্রতিষ্ঠা, নির্যাতিত-নিপীড়িত ও বঞ্চিতদের সাহায্য করা এবং জালিম-অবিচারকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বিষয় অর্থহীন কর্মে পর্যবসিত হবে। সত্য-ন্যায় বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না। বনে-জঙ্গলে যেরূপ জীবন সংগ্রামে কেবল 'যোগ্যতমরা টিকে থাকবে' নীতি কার্যকর, তেমনি মানুষের মধ্যেও বুদ্ধিমান, ধূর্ত, শক্তিশালী, ক্ষমতাবানরাই শুধু যোগ্য হিসাবে টিকে থাকার অধিকার রাখে– দুর্বল, অসহায়, বিকলাঙ্গ, নির্বোধ, রুগ্ন, ক্ষমতাহীনরা ধ্বংস হওয়ার যোগ্য ও বেঁচে থাকার অধিকার রাখে না। ধনীদের অধিকার রয়েছে দরিদ্রদের শোষণ করার। সুতরাং আইন ও নীতিবিজ্ঞানে ডারউইনিসমকে মেনে নিলে সত্য-সঠিক বিশ্বাস, মানবিক অধিকার ও মূল্যবোধ, বিবেক, কল্যাণমূলক কর্ম, মানবোচিত আচরণ, সুকোমল মনোবৃত্তি, ক্ষমা, দয়া, মহানুভবতা সবই অর্থহীন কর্ম হয়ে পড়বে এবং স্বার্থপরতা, উপযোগবাদিতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, অর্থগৃধ্নতা, লক্ষ্যে পৌঁছতে অন্যায় পথ ও মিথ্যাকে অবলম্বন করা সবই বৈধ কর্ম বলে বিবেচিত হবে। আর এরূপ ক্ষেত্রে ঐশী ধর্মের তো কোন বালাই থাকবে না। ফ্রয়েডের কিছু মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এবং কার্ল মার্কসের সামাজিক কিছু তত্ত্বও ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক।

আধুনিকতাবাদের অপর একটি চিন্তাগত ভিত্তি হল মানবতাবাদ যার সঙ্গে ইসলামের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সাধারণত 'মানবতাবাদ' শব্দটি এমন দার্শনিক চিন্তা ও

সকল অবস্থায় (অস্তিত্ব লাভ ও টিকে থাকার জন্য) সে স্রষ্টার ওপর নির্ভরশীল। তাই সেটা যেমন সৃষ্টির ক্ষেত্রে সত্তাগতভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় বরং স্রষ্টার ওপর নির্ভরশীল, তেমনিভাবে তার টিকে থাকার জন্যও তাঁর ওপর নির্ভরশীল।– অনুবাদক

ধারণার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যা মানুষের বিশেষ মর্যাদায় বিশ্বাস করে এবং নিরপেক্ষভাবে সকল মানুষকে সকল কিছুর (সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর এবং মূল্যবোধসমূহের) কেন্দ্র ও মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করে। প্রশ্ন হল আধুনিকতাবাদীরা কোন্ যুক্তি ও মানদণ্ডের ভিত্তিতে মানুষকে সকল কিছুর কেন্দ্র গণ্য করেছেন এবং স্রষ্টাসহ অতি প্রাকৃতিক সকল প্রকার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন? কোন প্রমাণের আলোকে নিরঙ্কুশ ও স্থায়ী কোন সত্তার বিদ্যমানতাকে অসম্ভব জ্ঞান করেছেন এবং মৃত্যু-পরবর্তী অনন্ত জীবনকে কাল্পনিক বলার প্রয়াস চালিয়েছেন?

অস্তিত্ব বিদ্যা (Onthology) ও পরিচিত বিদ্যা (Epistemology) উভয় দৃষ্টিতেই মানুষের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার পক্ষে কোন যুক্তি নেই।[১] খোদা, তাঁর সৃষ্ট বিশ্বব্যবস্থা ও ঐশী প্রত্যাদেশকে অলীক বলে প্রমাণ করার জন্য কোন দলিলও তারা উত্থাপন করে নি। তারা মানুষের চিন্তা, ধারণা, কল্পনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার ওপর ভিত্তি করে যে নৈতিকতা আইন সৃষ্টি করেছেন বিনা যুক্তিতে সেগুলোকে মানবিক মূল্যবোধ বলে গণ্য করেছেন। কখনই এই ধরনের দার্শনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়কে কিছু সংখ্যক মানবতাবাদী দার্শনিকের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর করে প্রমাণ অথবা প্রত্যাখ্যান করা যায় না। বরং দাবি করা যায় বুদ্ধিবৃত্তিক, ঐতিহাসিক, বর্ণনাগত ও অভিজ্ঞতালব্ধ অসংখ্য প্রমাণ এ সকল দাবির বিপরীত বিষয়কে প্রমাণ করে।

মানবতাবাদের অন্যতম প্রধান উপাদান হল আত্ম ও বিশ্বপরিচিতি অর্জন এবং মানুষের প্রকৃত সৌভাগ্য ও সফলতা নির্ণয়ে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে স্বাধীন-স্বনির্ভর ও যথেষ্ট বলে মনে করা।[২] মানবতাবাদীরা জ্ঞান ও পরিচিতির ক্ষেত্রে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করে যে, বিশ্বে এমন কোন বিষয় নেই যা মানুষ তার বুদ্ধির দ্বারা উদ্ঘাটন ও বুঝতে সক্ষম নয়। এ কারণেই তারা অস্তিত্বজগতের জ্ঞানের ক্ষেত্রে বস্তু-উর্ধ্ব সকল কিছুর–যেমন স্রষ্টা, ওহি, পরকাল, অলৌকিকতা ইত্যাদি–অস্তিত্বকে অস্বীকার ও

১. মানবতাবাদীদের একদল যেমন অস্তিত্ববাদীরা (Existentialist) মানুষের অসীম স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তারা মনে করে মানুষ যেমন চায় তেমন হতে পারে। জ্যাঁ পল সাঁত্রে বলেছেন : যদি একজন পঙ্গু ব্যক্তি দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম হতে না পারে তবে এর জন্য সেই দায়ী। অস্তিত্ববাদীরা কর্ম সম্পাদন ও বিকাশের ক্ষেত্রে মানুষকে সকল প্রকার আইন ও প্রথাগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঐশী প্রভাবক ও কারণ থেকে স্বাধীন বলে গণ্য করে। দ্রষ্টব্য : মালেকীয়ান, মোস্তফা, এগজিসটেনশিয়ালিজম, অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের দর্শন, পৃ. ১০-১৬। অথচ এ ধরনের অতিরঞ্জিত দাবির সপক্ষে কোন প্রমাণ ও দলিলের অস্তিত্ব নেই।

২. Abdagnano, Nicola, Encyclopedia of Philosophy.

অপ্রামাণ্য গণ্য করেছে। অধিকার নির্ধারণ ও আইন প্রনয়ণের ক্ষেত্রেও তারা কেবল মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ওপর নির্ভর করে থাকে।

মানবতাবাদীদের অধিকাংশ দল (এমনকি বলা যায় প্রায় তাদের সকলেই) মানুষকে নিছক বস্তুগত এক অস্তিত্ব জ্ঞান করে। তারা মানুষকে প্রকৃতির অন্যান্য প্রাণির মতোই এক সত্তা বলে মনে করে। মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণির পার্থক্য তাদের দৃষ্টিতে মানবসৃষ্ট বিভক্তি।[১]

আর তাই অস্তিত্বগত দৃষ্টিতে বাস্তবত এদের মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই। মানুষের সম্পর্কে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি একদিকে পাশ্চাত্য বিশ্বে উপযোগবাদ, ভোগবাদ ও বস্তুবাদিতার জন্ম দিয়েছে অন্যদিকে সকল প্রকার নৈতিক মূল্যবোধ, ঐশী আইন, আত্মিক মর্যাদা ও পূর্ণতা, আধ্যাত্মিকতা এবং চিরন্তন সৌভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

মূলত ইসলাম যে কারণে মানবতাবাদের সমালোচনা করে তা হল বুদ্ধিবৃত্তিকে গুরুত্বদানের ক্ষেত্রে তাদের বাড়াবাড়ি এতটা বেশি যে, একে তারা খোদার আসনে বসিয়েছে। বরং বলা যায় তারা বুদ্ধিবৃত্তিকে খোদার ওপর প্রাধান্য দান করেছে। তারা বুদ্ধিবৃত্তিকতাকে খোদামুখিতা ও খোদাকেন্দ্রিকতার স্থলাভিষিক্ত করেছে।

মানবতাবাদীদের দৃষ্টিতে মানবিক মূল্যবোধকে সমর্থন দান, দার্শনিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ ব্যবস্থাসমূহ ও ধর্মীয় মৌলনীতি ও বিশ্বাসসমূহকে গ্রহণ এবং আদর্শিক ও বিমূর্ত ধারণার ভিত্তিতে মানবিক মূল্যবোধকে প্রমাণের চেষ্টা অগ্রহণযোগ্য। অথচ মানুষের স্বাধীনতা যদি ধর্মীয় শিক্ষা এবং নৈতিক ও আইনগত মূল্যবোধের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত না হয় তবে বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেক মানুষের পাশবিক প্রকৃতি ও আত্মপ্রেমের দ্বারা অবদমিত হয় এবং যে কোন প্রকার অপরাধে লিপ্ত হতে বাধ্য করে।

আধুনিকতাবাদের ধারণায় ধর্ম হল মানুষের অভিজ্ঞতার ফসল যা সে মনোজগতের মাধ্যমে অর্জন করে (শ্লায়ার মাখের), যেহেতু বোঝার বিষয়টি সম্পূর্ণ আপেক্ষিক এবং ধর্মকে বোঝার স্বীকৃত কোন পদ্ধতি নেই সেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মতো করে ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থগুলোকে ব্যাখ্যা করতে পারে (গাডামারার হিরমোনেটিক দর্শনের

১. ইজ্জাতুল্লাহ ফুলাদভান্দ, প্রাচীন গ্রীস থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত পাশ্চাত্য দর্শনে মানব পরিচিতির ক্রমধারা 'নেগা'হে হাওজা সাময়িকী' ৫৩ ও ৫৪ নং সংখ্যা, পৃ. ১০৪-১১১।

ভিত্তিতে), ইসলামও যুগের পরিপ্রেক্ষিতে খ্রিস্টজগতের প্রোটেস্টান্ট ধারার মতো শত শত নব্যব্যাখ্যার মুখাপেক্ষি এবং ওহী ও দ্বীন, এমনকি খোদাও মানুষের চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিবৃত্তির আলোকে ব্যাখ্যাযোগ্য। ধর্মগ্রন্থকে নবিদের কল্পনা, স্বপ্ন ও চিন্তার ফসল মনে করা।

সুতরাং আধুনিকতাবাদ এমন এক বাস্তবতা যা মানুষ ও বিশ্ব সম্পর্কে বিশেষ দর্শন যার সাথে ধর্মীয় দর্শনে যে বুদ্ধিবৃত্তি, অভিজ্ঞতা, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার কথা বলা হয়েছে তার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কান্ট ও ডেকার্ট যে বুদ্ধিবৃত্তির কথা বলেন তার বৈশিষ্ট্য হল রহস্যময় কোন কিছুর অস্তিত্ব অস্বীকার। ম্যাক্স ওয়েবারের ভাষায় তা হল রহস্যবিরোধী আর ধর্মের স্বীকৃত বুদ্ধিবৃত্তি হল রহস্যময়তায় বিশ্বাসী। কান্টের নৈতিকতা কর্মগত বুদ্ধিবৃত্তির (বিবেক) সীমায় আবদ্ধ হয়েছে, ফলে কষ্টকর নৈতিক কর্মের সঙ্গে আত্মিক প্রশান্তি ও সৌভাগ্যের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে এবং এরূপ কর্ম কেবল মানুষের পূর্ণতার বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য হয়েছে। পরিণতিতে সৌভাগ্য শুধু বস্তুগত সুখ ও আনন্দের গণ্ডিতে সংজ্ঞায়িত হয়েছে। খোদার অস্তিত্ব যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে প্রমাণ অসম্ভব বলে ঘোষিত হয়েছে। এ কারণেই পরবর্তীকালে শ্লায়ার মাখের, উইলিয়াম জেমস, রুডলফ অটো ও অন্যদের চিন্তায় ধর্ম নবি ও ধর্মীয় ব্যক্তিদের আত্মিক ও অভ্যন্তরীণ এক অনুভূতি ও অভিজ্ঞতায় (রিলিজিয়াস এক্সপেরিয়েন্স) পর্যবসিত হয়েছে যা ব্যক্তিভেদে বিভিন্নরূপ লাভ করে, এমনকি বিভিন্ন ধর্মের ব্যক্তিদের মধ্যে বিদ্যমান মতগত চরম বৈপরীত্য সত্ত্বেও তাদের ভাষায় সব ধর্ম (খোদাহীনতা, এক খোদা ও বহুখোদার) সমানভাবে সঠিক ও সত্য বলে গণ্য হয়েছে। যার অর্থ হল নির্ভেজাল সত্যের অনুপস্থিতি ও পরম আপেক্ষিকতা। ধর্ম তাদের দৃষ্টিতে ব্যক্তির চিন্তা ও জ্ঞানের সাথে সম্পর্কহীন এবং একান্ত বিশ্বাসনির্ভর এক বিষয়। কিন্তু ইসলামে নৈতিকতা কেবল বিবেক ও বিশ্বাসনির্ভর বিষয় নয়; বরং একই সাথে ঐশী শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা সমর্থিত। তেমনি ঈমানও নিছক ধর্মীয় অনুভূতি উৎসারিত নয়; বরং যুগপৎভাবে জ্ঞান ও আত্মিক অনুভূতি উৎসারিত।

সুতরাং ইসলাম ও আধুনিকতাবাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই বৈপরীত্য রয়েছে। মুসলিম চিন্তাবিদরা এ বৈপরীত্যের সমাধানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছেন। কিছু সংখ্যক মুসলিম চিন্তাবিদ, যেমন জামালুদ্দিন আফগানি ও শেখ মুহাম্মাদ আবদুহ মনে করেন আধুনিক পাশ্চাত্য ও ইসলামের মধ্যে মৌলিক কোন বৈপরীত্য নেই; মূল

সমস্যা আমাদের মুসলমানদের মধ্যে, যে কারণে আমরা পশ্চাদপদ হয়ে আছি। অবশ্য সাইয়্যেদ জামাল বুদ্ধিবৃত্তি ও অভিজ্ঞতার ব্যবহারের ওপর দৃষ্টি আকর্ষণ করার পাশাপাশি পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতিকে পরিহারের দিকে গুরুত্বারোপ করেছেন। আবার কেউ কেউ, যেমন সাইয়্যেদ কুতুব ইসলাম ও আধুনিকতাবাদের মধ্যে সমঝোতার কোন সুযোগ নেই বলে আধুনিকতাবাদকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যানের কথা বলেছেন। অন্যদিকে স্যার সাইয়্যেদ আহমাদের মতো পাশ্চাত্যভক্ত ব্যক্তিরা দ্বীনকে আধুনিকতাবাদের ভিত্তিতে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস চালিয়েছেন।

কিছু সংখ্যক চিন্তাবিদ, যেমন আল্লামা ইকবাল, আয়াতুল্লাহ মোরতাযা মোতাহহারী, ডক্টর আলী শরীয়তি এ দুয়ের মধ্যে শর্তসাপেক্ষে সমন্বয় সাধন সম্ভব বলেছেন। তাঁরা বোঝার ক্ষেত্রে দ্বীনি শিক্ষায় বিদ্যমান সমস্যা দূরীকরণ ও ভ্রান্ত চিন্তার সংস্কার এবং ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা দানের মাধ্যমে আধুনিকতাবাদের সঙ্গে ইসলামকে সামঞ্জস্যশীল করা সম্ভব বলেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁরা ভ্রমের শিকার হয়েছেন। কেননা, তাঁরা আধুনিকতার পেছনে বিদ্যমান দর্শন ও সংস্কৃতিকে যথাযথ পর্যালোচনা না করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যার সাপেক্ষে এ সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু আধুনিকতাবাদকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ, মানবতাবাদ, উদারতাবাদ, ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক দর্শন ও বস্তুবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ইসলামের সাথে সমন্বিত করা অর্থহীন। আলী শারীয়তী চেষ্টা করেছেন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আধুনিকতার সাথে ইসলামের মিল দেখাতে। তিনি ইসলামের সর্বজনীন মতকে উপেক্ষা করে একান্ত ব্যক্তিমতের দৃষ্টিতে ভিন্নরূপ ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাহ্যিক সমন্বয়ের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। অবশ্য তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার সমালোচনা করেছেন এবং এরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আধুনিকতার মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে ও ইউরোপের বাইরে যেসব দেশ (এশিয়া ও আফ্রিকা) তাদের অন্ধ অনুকরণ করেছে তারা লক্ষ্যহীনভাবে ঐ সভ্যতা থেকে গ্রহণ করেছে, ফলে রং-বেরঙের মোজাইকের রূপ ধারণ করেছে– যার মধ্যে উট, নেকড়ে ও গরুর সমন্বয়ে গঠিত সমাজের সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে যে ভোগবাদিতার সাথে ইসলামের কোন মিল নেই তাও মুসলিম সমাজে ঢুকে পড়েছে। তিনি পাশ্চাত্যের দৃষ্টির আত্মাহীন বস্তুসর্বস্ব মানুষের সংজ্ঞাকে প্রত্যাখ্যান করে মানুষকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন : মানুষ এমন এক প্রাণী যা স্বপ্ন ও কল্পনার অধিকারী,

আদর্শবাদী, বিদ্রোহপ্রবণ, গোঁড়া, সৃষ্টিশীল, প্রতীক্ষমাণ, কৌশলী, রাজনীতিক, জ্ঞানসম্পন্ন, দায়িত্বশীল, বিকাশমান ও স্বাধীন সত্তার অধিকারী।[১] তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার নয়টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলেছেন : ক্ষমতার মৌলিকতা, বস্তু ও প্রকৃতিকেন্দ্রিকতা, পার্থিব জীবনের মৌলিকতা, ভোগবাদিতা, সকল কিছুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণমুখিতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ (পুঁজিবাদের ক্ষেত্রে), মানবতাবাদ ও সমাজবাদিতা (কমিউনিজমের ক্ষেত্রে)।[২] বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য দর্শনগুলোর বৈশিষ্ট্য হল নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী, মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়, বিশ্বের উদ্দেশ্যহীনতা, জীবনের অর্থহীনতা, স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা, বিশ্বের প্রতি অনাস্থা, মানসিক অস্থিরতা, সভ্যতার প্রতি অবিশ্বাস ও নৈরাশ্যবাদিতা। তিনি একদিকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সমালোচনা করলেও এর ইতিবাচক দিককে গ্রহণ করা উচিত বলেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে বর্তমানের মানুষ পূর্বের থেকে অধিক ধর্মের মুখাপেক্ষী। পূর্বে অজ্ঞতা, অক্ষমতা, ভয় ও বস্তুগত প্রয়োজন ধর্মের ভিত্তি ছিল ও মানুষ সবকিছু ধর্ম থেকে কামনা করত। এখন যদিও বিজ্ঞান তাদের অনেক প্রয়োজনই পূরণ করছে, কিন্তু উৎকর্ষের অধিকারী এক ধর্মের অনুপস্থিতি তাদেরকে দিশেহারা অবস্থায় ফেলে রেখেছে– যা মানুষের জন্য বিশ্বকে ব্যাখ্যা করবে ও জীবনকে অর্থবহ করবে। এমন কোন ধর্ম নয়, যা ক্ষমতাবানদের পৃষ্ঠপোষক ও মানুষের ওপর তাদের জুলম ও অবিচারকে বৈধতা দান করে। ঐতিহাসিকভাবে যে জ্ঞান ও বিজ্ঞান মানবতাকে পদদলিত করে ও দাসত্বের হাতিয়ার তা সমর্থনযোগ্য নয়।[৩]

আমার (লেখক)[৪] মতে মনোগত দৃষ্টিভঙ্গি, ভাববাদ ও বিষয়কেন্দ্রিকতা (যার পরিণতি পরম আপেক্ষিকতাবাদ) হল আধুনিকতাবাদের মূল ও সার যার সাথে ইসলামের পূর্ণ বৈপরীত্য রয়েছে। ইসলাম (বিশ্ব ও মানুষ সম্পর্কে) পরিচিতির মাধ্যম এবং চিন্তা ও কর্মের সঠিকতা যাচাইয়ের মানদণ্ড হিসাবে মানুষের স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তির স্বীকৃতি দেয়। ইসলাম বলে মানুষ তার স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্ব, নবুওয়াত ও ইমামতের প্রয়োজনীয়তা, পরকালীন জীবনের আবশ্যকতা ইত্যাদি প্রমাণ এবং বিবেক ও কর্মগত বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে ভালো-মন্দ নির্ণয় করতে সক্ষম।

---

১. শারীয়াতী, ইনসানে বিখুদ, মাজমুয়ে আসার ২৫তম খণ্ড, পঞ্চম প্রকাশ, তেহরান, কালাম প্রকাশনা, পৃ.২১।
২. শারীয়াতী, মাজমুয়ে আসার, ৩১তম খণ্ড, পৃ. ১৪৯-১৭১।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ.২৯-৩৩।
৪. ডক্টর আব্দুল হোসাইন খসরুপানাহ।

কিন্তু ইসলামি জ্ঞান বলে যখন মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে ওহি ও ধর্মের সত্যতা প্রমাণ করবে তখন জ্ঞানের মাধ্যম হিসাবে মানবিক চিন্তাশক্তির পাশাপাশি জ্ঞান পরিচিতির উৎস হিসাবে খোদায়ী পরিচায়ক স্থান লাভ করবে যা আমাদের নিকট ওহির স্বরূপ, ধর্মের সীমা এবং পার্থিব ও পরলৌকিক বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করবে এবং নতুন এক দিক আমাদের সামনে উন্মোচন করবে। ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তি এ দুয়ের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে।

এ সমন্বিত চিন্তা তখন একসাথে সকল কিছুকে যাচাইয়ের মাপকাঠি বিবেচিত হয়। তাই আমরা আধুনিকতাবাদের অর্জিত সবকিছুকে ঢালাওভাবে স্বীকৃতি দিতে পারি না। আর আমাদের এ অধিকারও নেই যে, আধুনিকতাবাদের সাথে ইসলামকে সামঞ্জস্যশীল করার জন্য একে নিজেদের মনমতো ব্যাখ্যা করব।

মুসলমান হিসাবে আমাদের চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাসের সাথে আধুনিকতাবাদ ও নব্যআধুনিকতাবাদের জ্ঞানগত ভিত্তির মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। যে স্বনির্ভর বুদ্ধিবৃত্তি ওহিকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে আমরা তা যৌক্তিক কারণেই মেনে নিতে পারি না। তবে আমরা আধুনিকতাবাদের কিছু অর্জনকে তার চিন্তাগত ভিত্তি ও মতাদর্শ থেকে আলাদা করে গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু আমাদের এরূপ নির্বাচিত গ্রহণ আধুনিক সমাজকে বর্জন করা অসম্ভব হওয়ার কারণে বাধ্য হয়ে নয়; বরং ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিই আমাদের বলে এটা গ্রহণ করা উচিত। এক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের এবিষয়টি দৃষ্টিতে রাখতে হবে যে, আধুনিকতাবাদ সর্বকামী এক মতবাদ যা সারা বিশ্বকে তার সংস্কৃতি ও চিন্তা-বিশ্বাসের অধীন করতে চায়। সে চায় সকল মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস, কর্ম ও আচরণে এ মতবাদের প্রসার ঘটাতে। তাই সে কখনই চায় না কেউ তা থেকে বাছাই ও সংস্কার করে গ্রহণ করুক। কিন্তু মুসলিম চিন্তাবিদদের উচিত ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তির মানদণ্ডে আধুনিকতাবাদের চিন্তাগত ভিত্তিকে পর্যালোচনা করা এবং প্রকৃতিবাদ, নিমিত্তস্বরূপ বুদ্ধিবৃত্তি (ইন্সট্রুমেন্টাল রেশনালিজম), বিষয়কেন্দ্রিকতা (সাবজেক্টিভিজম), সেক্যুলারিজম ও মানবতাবাদকে যথাযথ বিশ্লেষণ করে তা খণ্ডন করা। সেইসাথে আধুনিক বিজ্ঞান, শিল্প-প্রকৌশল ও টেকনোলজিকে যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করা। অতঃপর নিজস্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-প্রকৌশল ও সংস্কৃতি দ্বারা একে সমৃদ্ধ করা।

অনুবাদ : এ, কে, এম আনোয়ারুল কবীর

শিশু-কিশোর ও যুবকদের প্রতি মহানবী (সা.)-এর আচরণ

মুহাম্মাদ আলী চানারানী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যুবসমাজের জীবনীশক্তি

প্রথম অংশটিতে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) শিশুদের প্রতি কীরূপ আচরণ করতেন তার বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে রাসূলুল্লাহ (সা.) যুবকদের প্রতি যেরূফ আচরণ করতেন সেটি বিবেচনায় আনা হয়েছে। এটি থেকে আশা করা যায় হচ্ছে যেন এটি মুসলিমদের এবং সমগ্র সমাজের জন্য দিকনির্দেশনা হতে পারে। মানবশক্তি একটি দেশের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ এবং এই সম্পদটির সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ হলো যুবক। এটি এমন একটি শক্তি যা জীবনের সমস্যাসমূহ দূর করতে পারে এবং কঠিন ও রুক্ষপথের বাধা পেরিয়ে যেতে পারে।

যদি ফার্মসমূহ সবুজ হয় এবং ভারী কারখানার বড় চাকা সচল থাকে, যদি খনিজ পদার্থ ভূগর্ভ থেকে উত্তোলিত হয়, যদি এমন সকল স্থাপনা থাকে যা আকাশচুম্বি, যদি শহরসমূহ উন্নত হয় এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক খাত উত্থিত হয়, যদি রাষ্ট্রের সীমানা অন্য দেশের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকে এবং সম্পূর্ণ সুরক্ষা বিদ্যমান থকে তবে এসকল যুবকদের মূল্যবান কার্যসমূহের কারণেই সম্ভব হয়েছে। এই অদম্য শক্তিই সকল রাষ্ট্রের আশার কারণ।

ব্যক্তিগত দায়িত্ব এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালনের দিকে ধাপ বাড়ানোর মাধ্যমে একজনের বাল্যকালের সমাপ্তি ঘটে ও যৌবনকালের দিকে এক ধাপ অগ্রসর হয়। এভাবে পুরো পৃথিবী এই যুবশক্তির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করে এবং তারা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিল্প এবং নৈতিকতাসহ সকল ক্ষেত্রেই বিশেষ অবস্থান অর্জন করেছে।

বিগত চৌদ্দ শতক ধরে পবিত্র ধর্ম ইসলাম এর ব্যাপক ও পুনরুজ্জীবিতকারী কর্মসূচিসমূহের ক্ষেত্রে যুবকদের প্রতি বিশেষ ও অনুপম দৃষ্টি প্রদান করেছে। ইসলাম যুবকদের জন্য সকল বস্তুগত, আত্মিক, মানসিক, শিক্ষা বিষয়ক, নৈতিক, সামাজিক দুনিয়াবি ও আখিরাতের বিষয় নিয়ে বিধান সৃষ্টি করেছে। যেখানে অন্যান্য ধর্ম ও সংস্কৃতি শুধু যুবকদের জগতের মাত্র কিছুটা অংশের বিধান দিয়েছে।

যৌবনকালের মূল্য

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এ যুগে যুবক ও তাদের মূল্য সকল রাষ্ট্র ও জনগণের দ্বারা মূল্যায়িত এবং সর্বত্রই তারা আলোচিত। সুতরাং গবেষক, চিন্তাবিদ এবং লেখকগণ এই যৌবন বয়সের বিষয়াদি বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে বর্ণনা করেছেন।

ধর্মবিষয়ক পণ্ডিতগণ যৌবনকালকে আল্লাহর একটি মূল্যবান নেয়ামত এবং সুখের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে অভিহিত করেছেন। মুসলিমদেরকে এটি বিভিন্ন পন্থায় স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন : 'আমি তোমাদেরকে যুবকদের সাথে ভালো আচরণ করার উপদেশ প্রদান করছি, যেহেতু তার হৃদয় কোমল যা জ্ঞান অর্জনের জন্য আগ্রহী থাকে। মহান আল্লাহ আমাকে মানুষদেরকে আল্লাহর ক্ষমা ও তাদের কর্মের শাস্তি সম্পর্কে জানানোর জন্য রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। যুবকরা আমার বাণী গ্রহণ করেছিল এব আমার নিকট আনুগত্যের শপথ করেছিল। কিন্তু বৃদ্ধরা আমার নিকট আনুগত্য প্রকাশ করে নি; বরং বিরোধিতা করেছিল।'[১]

হযরত আলী (আ.) বলেন : 'দুটি বস্তু যার পরিমাণ ও মূল্য যে হারিয়েছে তার ব্যতীত সকলের নিকট অজানা। তার একটি হলো যৌবন, এর অপরটি হলো সাস্থ্য।'[২]

১. বা তারবিয়াতে মাকতাবি অ'শনা' শাভীম, [আসুন, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিপালনের সাথে পরিচিত হই], পৃ. ৩২০
২. শারহে গুরারুল হিকাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৩

যখন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাসান আন্দোলন করেন এবং জনগণের সমর্থন পান তখন তিনি ইমাম সাদিক (আ.)-এর নিকট আসেন এবং তাঁর সমর্থন দাবি করেন। ইমাম সাদিক (আ.) তা অস্বীকার করেন এবং তাঁকে কিছু বিষয় স্মরণ করিয়ে দেন। তার মধ্যে একটি ছিল যুবকদের উপদেশ প্রদানের ব্যাপারে। ইমাম সাদিক (আ.) বলেন : 'যুবকদের তোমার আশে-পাশে রাখবে এবং বৃদ্ধদের তোমার থেকে অনেক দূরে রাখবে।'[১]

এই উপদেশটির মাধ্যমে ইমাম সাদিক (আ.) যুবকদের মূল্য ও প্রয়োজনীতার নমুন প্রদর্শন করেন এবং এই নিয়ামতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আবু যারকে বলেন : 'পাঁচটি জিনিস হারানোর পূর্বেই শুকরিয়া আদায় কর; এর একটি হলো যৌবনকাল, বৃদ্ধ হবার পূর্বেই এর জন্য আল্লাহর প্রশংসা করতে শেখ।'[২]

যৌবনকালের প্রতি মনোযোগ

ইসলামের সত্যিকার নেতৃবর্গ যুবকদের বিশুদ্ধ চেতনা ও নৈতিকতা ও মানবিক নীতির প্রতি তাদের মনোযোগ সম্পর্কে মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন। তাঁরা সবসময় শিক্ষক ও দিকনির্দেশকদেরকে যুবকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই মূল্যবান বিনিয়োগটিকে কাজে লাগাতে হবে তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

ইমাম সাদিক (আ.)-এর একজন বন্ধু জাফর আহওয়াল শিয়া মতাদর্শ প্রচার এবং মহানবী (সা.)-এর পরিবারের শিক্ষা মানুষের মাঝে প্রচার করেন। একদিন তিনি ইমাম সাদিক (আ.)-এর নিকট আসলেন। ইমাম সাদিক (আ.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : 'রাসূলের পারিবারিক শিক্ষা সম্বন্ধে বসরার জনগণের কিরূপ গ্রহণযোগ্যতা দেখতে পেলে এবং কী মাত্রায় তারা এই মাযহাব গ্রহণ করছে?'

১. আল কাফী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩
২. বিহারুল আনওয়ার, ৭৭তম খণ্ড, পৃ. ৭৫; ৮১তম খণ্ড, পৃ. ১৭৩ ও ৭১তম খণ্ড, পৃ. ১৮০; আল খিসাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৩

তিনি জবাব দিলেন : 'খুবই কম সংখ্যক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পারিবারিক শিক্ষা গ্রহণ করছে।'

ইমাম সাদিক (আ.) তাঁকে বললেন : 'যুবক বয়সীদের ওপর তোমার প্রাচর কার্য চালাও এবং তোমার শক্তি তাদের পথনির্দেশনার কাজে লাগাও। কারণ, তারা সত্যকে দ্রুত গ্রহণ করে এবং উত্তম জিনিসের দিকে দ্রুত ঝুঁকে পড়ে।'[১]

ইসমাইল ইবনে ফায্ল হাসিমি ইমাম সাদিক (আ.)-কে প্রশ্ন করেন : 'ইয়াকুব কেন ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদেরকে ক্ষমা করতে বিলম্ব করেছিলেন যারা তাঁকে কুয়ার ফেলে দিয়েছিল, কিন্তু ইউসুফ তাৎক্ষণিক তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন?'

ইমাম সাদিক (আ.) বলেন : কারণ, যুবকদের হৃদয় সত্যকে বৃদ্ধ লোকদের তুলনায় দ্রুত গ্রহণ করে।'[২]

এই দুটি হাদিস এটি প্রকাশ করে যে, যুবকরা সৎকর্ম ও উত্তম বিষয়কে ভালোবাসে এবং প্রাকৃতিকভাবে এর দিকে আকৃষ্ট হয়। এছাড়াও ভদ্র আচরণ, সত্য কথা বলা, প্রতিশ্রুতি পালন, তাদের নিকট গচ্ছিত আমানত ফিরিয়ে দেয়া, মানুষের সেবা করা, আত্মত্যাগ এবং এরূপ নৈতিক গুণের প্রতি আকৃষ্ট থাকে এবং তারা অবাঞ্ছিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলিকে ঘৃণা করে ও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

কিছু লক্ষ্যণীয় বিষয়

ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের মতে, যৌবনকাল একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। যদি এখানে এমন কেউ থঅকে যে, সুখী থাকতে চায় এবং এই মূল্যবান শক্তির সুব্যবহার করতে চায় তবে তাদেরকে কিছু লক্ষ্যণীয় বিষয়ের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

১. যৌবনকাল একজনের জীবনের সবচেয়ে বেশি মূল্যবান এবং ফলপ্রসূ সুযোগ।

২. সাফল্যের একটি প্রাথমিক শর্ত হলো যৌবনশক্তিকে ব্যবহার ও কাজে লাগানো।

---

১. রওযা আল-কাফী, পৃ. ৯৩
২. সাফিনাতুল বিহার, কাল্ব (অন্তর) সম্পর্কিত প্রবন্ধ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪২

৩. কোন ব্যক্তির সুখী অথবা দুঃখী হওয়ার কারণ তার যৌবনের ওপর নির্ভরশীল। সে তার সামর্থ্য ও সুযোগের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে তার সুখ নিশ্চিত করতে পারে।[১]

পুনরুত্থান দিবসে একজনের যৌবন কালের প্রশ্নসমূহ

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন : 'পুনরুত্থান দিবসে নিম্নোক্ত প্রশ্নসমূহের জবাব প্রদান ছাড়া কেউ এক কদমও এগুতে পারবে না।

প্রথমত, কিসের জন্য সে জীবন ধারণ করেছে?

দ্বিতীয়ত, কিভাবে সে তার যৌবন অতিবাহিত করেছে?'[২]

মহানবী (সা.)-এর এসব উক্তি এটিই নির্দেশ করে যে, কীভাবে ইসলাম যৌবনকালের জীবনীশক্তিকে মূল্যায়ন করেছে ও এর প্রতি মনোযোগ দিয়েছে। এই মূল্যবান সম্পদ এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, পুনরুত্থান দিবসে তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

নৈতিক গুণসম্পন্ন যুবশক্তি হলো একটি সুগন্ধি ফুলের মতো, যার পরিচ্ছন্নতার সাথে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও মনোমুগ্ধকর সুবাস রয়েছে। কিন্তু যদি যৌবনকালের নৈতিক মূল্য না থাকে তবে সেটি একটি কাটার মতো যা কখনই কেউ পছন্দ করে না।

মহানবী (সা.) বলেন : 'একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি তার নিজের জন্যই তার ক্ষমতার ব্যবহার করা উচিত এবং এই দুনিয়াকে আখিরাতের জন্য ব্যবহার করতে হবে এবং বৃদ্ধ হবার পূর্বেই তার যৌবনকে ব্যবহার করতে হবে।'[৩]

তিনি আরো বলেন : 'প্রতি রাতে ফেরেশতাগণ ২০ বছর বয়সী যুবকদেরকে যথাযথ যোগ্যতা ও সুখ অর্জনের জন্য কর্মঠ ও সচেতন হতে বলেন।'[৪]

সুতরাং যৌবনকালে কিছু আলাদা দায়িত্ব, সচেতনতা, প্রস্তুতি গ্রহণ এবং কর্মঠ হবার সময়। যারা এই নেয়ামতের সঠিক ব্যবহার করবে না তাদেরকে দোষারোপ করা হবে।

---

১. বিহারুল আনওয়ার, ৭১তম খণ্ড, পৃ. ১৮০; আমালিয়ে সাদুক, পৃ. ২৫
২. গোফতারে ফালসাফি, জাভান [দার্শনিক বাণী, যুবক], ১ম খণ্ড, পৃ. ৭১
৩. ওয়াসায়েলুশ শিয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩০
৪. মুসতাদরাকুল ওয়াসায়েল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০

মহান আল্লাহ বলেন : 'আমরা কি তাকে একটি দীর্ঘ জীবন দেই নি যাতে সে তার.....।'[১]

ইমাম সাদিক (আ.) বলেন : 'এই আয়াতটি সেসকল অমনোযোগী যুবককে নির্দেশ করে যারা আঠারো বছর বয়সে উপনীত হয়েছে এবং তাদের যুবশক্তিকে ব্যবহার করে না।'[২]

শিশুদের প্রতি মমতা ও ভালোবাসা মহানবীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল।[৩]

একদিন মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা এমন একটি স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে শিশুরা খেলা করছিল। তিনি তাদের মধ্যকার একজনের পাশে বসলেন ও তার কপালে চুম্বন করলেন এবং তার সাথে সদয় আচরণ করলেন। সাহাবীদের কেউ একজন মহানবীকে এমন আচরণ করার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। মহানবী (সা.) জবাব দিলেন : 'একদিন আমি এই বালকটিকে আমার সন্তান (নাতি) হুসাইনের সঙ্গে খেলা করতে দেখেছিলাম। সে হুসাইনের পায়ের নিচ থেকে মাটি তুলে নিয়ে তার মুখে মেখেছিল। যেহেতু সে হুসাইনের বন্ধু সেজন্য আমিও তাকে পছন্দ করি। জিবরাইল আমাকে বলেছেন যে, এই শিশুটি কারবালায় হুসাইনের সাথিদের অন্যতম হবে।[৪]

ইমাম সাদিক (আ.) বলেন : "মূসা ইবনে ইমরান (আ.) তাঁর মোনাজাতে জিজ্ঞেস করেছিলেন : 'হে আল্লাহ! তোমার কাছে কোন্ কাজগুলো সবচেয়ে উত্তম?' তাঁর নিকট প্রত্যাদেশ করা হয়েছিল : 'শিশুদের সাথে বন্ধুত্ব করা আমার কাছে সকল কাজের মধ্যে উত্তম, যেহেতু শিশুরা প্রকৃতিগতভাবেই খোদাভীরু এবং আমাকে ভালোবাসে। যখন কোন শিশু মারা যায় তখন আমি ক্ষমাশীল হয়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাই।'"[৫]

কিন্তু শিশুদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসা প্রদর্শন ক্ষতিকর। অনেক বর্ণনাতেই অতিরিক্ত ভালোবাসা প্রদর্শনের বিষয়টিকে নিষেধ করা হয়েছে।

---

১. সূরা ফাতির : ৩৭
২. তাফসীরে আল-বুরহান, উপরিউক্ত আয়াতের তাফসীর
৩. আল মুহাজ্জাতুল বাইদা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৬
৪. বিহারুল আনওয়ার, ৯৭তম খণ্ড, পৃ. ১০৪ ও ১০৫
৫. বিহারুল আনওয়ার, ৪৪তম খণ্ড, পৃ. ২৪২, হা. ৩৬

ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনের প্রতি মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসা

ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনের প্রতি মহানবীর গভীর ও ভীষণ ভালোবাসা ছিল। এ সংক্রান্ত কিছু অকাট্য বর্ণনা নিচে উল্লেখ করা হলো :

সুন্নি গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে উমরের উদ্ধৃতি এভাবে দেয়া হয়েছে যে, তিনি বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন : 'হাসান এবং হুসাইন এ দুনিয়াতে আমার সুগন্ধময় ফুল।'"[১]

আনাস ইবনে মালিক বর্ণনা করেন : 'মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো : 'আপনার পরিবারের মধ্য থেকে কোন্ ব্যক্তিকে আপনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন।' মহানবী জবাব দেন : 'আমি হাসান ও হুসাইনকে অন্যদের চেয়ে বেশি ভালোবাসি।'[২]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, সাঈদ ইবনে রাশিদ বলেন : "ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন মহানবীর দিকে দৌড়ে আসলেন। তিনি তাদেরকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন : 'এই দুইজন দুনিয়াতে আমার সুগন্ধী ফুল।'"[৩]

ইমাম হাসান (আ.) বলেন : "মহানবী (সা.) আমাকে বলেন : 'হে আমার সন্তান! তুমি আমার শরীরের অংশসদৃশ; তাদের ভালো হোক যারা তোমাকে এবং তোমার সন্তানদেরকে ভালোবাসবে এবং তাদের জন্য আফসোস যারা তোমাকে হত্যা করবে।'"[৪]

ইমাম হুসাইনের প্রতি মহানবীর ভালোবাসা এত বেশি ছিল যে, তিনি তাঁর ক্রন্দন সহ্য করতে পারতেন না।

ইয়াযীদ বিন আবি যিয়াদ বলেন : 'মহানবী (সা.) হযরত আয়েশার ঘর থেকে বের হয়ে হযরত ফাতিমার ঘর অতিক্রম করছিলেন। তিনি হুসাইনের ক্রন্দনধ্বনি শুনলেন এবং ফাতিমাকে বললেন : 'তুমি কি জান না, হুসাইনের ক্রন্দন আমাকে ব্যথিত করে?'[৫]

---

১. ইহকাকুল হক, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৫
২. ইহকাকুল হক, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৫
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৯, ৬১৯, ৬২১, ৬২৩।
৪. ইহকাকুল হাক এর পরিশিষ্ট, ১১তম খণ্ড, পৃ. ৩১১-৩১৪
৫. প্রাগুক্ত

যুবকরা ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট

ধর্মের প্রতি আকর্ষণ মানবের সহজাত প্রবণতাগুলোর অন্যতম যা যুবকদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়, যেহেতু তারা পরিণত। আর অন্যান্য স্বাভাবিক প্রবণতার মতো এটিও তাদেরকে কিছু কর্মে প্রবৃত্ত করে।

যুবকরা স্বাভাবিকভাবেই ধর্মীয় বিষয়াদি বুঝতে খুবই আগ্রহী। তাই তারা ভালোবাসা ও আগ্রহসহকারে খোলাখুলিভাবে ধর্মীয় উপদেশাবলি গ্রহণ করে। বড় বড় চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিষয়ক মনস্তত্ত্ববিদ এই অভিমত পোষণ করেন।

জন বি সাইজিল বলেন : 'যেসব গবেষণা চালানো হয়েছে সেসব অনুযায়ী সাধারণভাবে ধর্মের বিশ্বাসের শক্তি বার বছর বয়সে শুরু হয়।'[১]

অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মতে, বার বছর বয়সে অর্থাৎ যুব বয়সের শুরুতে যুবকদের মধ্যে আরেকটি আকর্ষণ তৈরি হয় এবং তা হলো ভালোবাসা ও ধর্মে আগ্রহ। এই প্রবণতা যুবকদের মধ্যে অন্যান্য প্রাকৃতিক আগ্রহ ও ঝোঁকের সাথে উদ্ভব হয় এবং ষোল বছর বয়সে তার চূড়ায় পৌঁছা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।[২]

ফলে যুবকরা অন্যদের অপকর্ম ও খারাপ ব্যবহার দ্বারা বিরক্ত হয় এবং অন্যদের বিচ্যুতিতে অত্যন্ত দুঃখ পায়– যখন তারা বিশ্বের সর্বত্র সর্বদা নৈতিক গুণের বিকাশ কামনা করে এবং সত্যিকার মূল্যবোধের প্রসার ঘটানোর চেষ্টা চালায়।

যুবকদের ওপর ধর্মীয় শিক্ষার প্রভাব

ধর্মীয় উপদেশাবলি এবং বিশ্বাস ও নৈতিক গুণের উৎকর্ষ যুবকদের মধ্যে দুটি বড় প্রভাব ফেলে :

১. যুবকদের সহজাত ধর্মীয় অনুভূতি এতে পরিতৃপ্ত হয়

---

১. শাদ কামি [সুখ], পৃ. ৪
২. গোফতা'রে ফালসাফি, জাভান [দার্শনিক উপদেশাবলি, যুবক, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৫]

২. বিশ্বাস ও ধর্মের শক্তি যুবকদের অন্যান্য প্রাকৃতিক ও প্রবৃত্তিগত অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেগুলো চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাকে বা বিদ্রোহী হওয়াকে প্রতিরোধ করে। পরিণতিতে তারা দুর্ভাগ্য ও বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে নিরাপদ ও সংরক্ষিত থাকে।

এটি উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলাম পশিক্ষণের জন্য কর্মসূচি গড়ে তুলেছে এবং বিশ্বাস ও নৈতিকতাকে দৃঢ় করার জন্য– যবকদের উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে মৌল উপাদান তাদের প্রয়োজনের সাথে সমন্বয় করে।

সুতরাং যখন যুবকদের মধ্যে ধর্মীয় বিষয়াদি জানার জন্য অধিকতর আকাঙ্ক্ষা জাগে এবং তারা ধর্মীয় নিয়ম-কানুন জানার জন্য আগ্রহান্বিত হয় এই সুযোগকে অপচয় না করে ধর্মীয় নেতারা অবশ্যই তাদেরকে গঠনমূলক ধর্মীয় কর্মসূচি দেবেন এবং কোরআন শেখা, ধর্মীয় নিয়ম, আল্লাহর সেবা করার পথ, নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিরোধের পথ এবং সৎকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করার জন্য উৎসাহ দেবেন।

ইমাম সাদিক (আ.) বলেন : 'যে কোরআন পাঠ করে, যদি সে একজন বিশ্বাসী যুবক হয়, তাহলে কোরআন তার রক্তে-মাংসে মিশে যায় এবং তার শরীরের সকল অংশকে প্রভাবিত করে।'[১]

তিনি আরো বলেন : 'বালকরা সাত বছর বয়স পর্যন্ত খেলাধুলা করে, সাত বছর লেখা শেখে এবং সাত বছর ধর্মীয় জায়েয ও নাজায়েয বিষয় শেখে।'[২]

ইমাম বাকির (আ.) বলেন : 'যদি আমি একজন যুবক শিয়াকে দেখি, যে ধর্মের নিয়ম-কানুন শিখছে না এবং এই দায়িত্বে অবহেলা করে তাহলে আমি তাকে শাস্তি দেব।'[৩]

সুতরাং যেসব যুবক মূল্যবান নৈতিক ও মানবীয় গুণাবলির সাথে বেড়ে উঠতে চায় এবং যারা সবচেয়ে আলোকিত আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে চায় তারা তাদের ব্যক্তিগত কামনা-বাসনাকে স্বাভাবিক ও জটিল পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণ করার চর্চা করে এবং পবিত্রতা ও সত্যতার জীবন যাপন করে, তারা অবশ্যই ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি নজর দেয় যুব বয়সের শুরুতে এবং ব্যবহারিক কর্মসূচি পালন ও ধর্মীয় নির্দেশনা

১. ওয়াসায়েলুশ শিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪০
২. আল কাফি, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৭
৩. সাফিনাতুল বিহার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮০, যুবক সম্পর্কিত প্রবন্ধ

অনুসরণ করে আল্লাহর সাথে তাদের আধ্যাত্মিক অঙ্গীকার পূরণ করে এবং তাঁকে সর্বদা স্মরণে রাখে।

যুবক বয়সের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি অমনোযোগিতার ফল

কিশোর ও যুবকদের অনুভূতির প্রতি অমনোযোগিতা সৃষ্টি-প্রকৃতির বিরোধী। সৃষ্টির নিয়ম-নীতিকে অস্বীকার শাস্তিবিহীন থাকবে না। কারণ, এই সকল প্রত্যাখ্যানের ফল বিশ্বব্যাপী বিকৃতি বৃদ্ধি এবং যুবকদের নিয়ন্ত্রণ না করতে পারাতে পর্যবসিত হবে। পরিসংখ্যান বলে যে, পাশ্চাত্য বিশ্বে যুবকদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেসব দেশ ধর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে দূরে।

নিয়ম লঙ্ঘন, চুরি, আইন ভঙ্গ, জ্ঞান অর্জনের প্রতি অমনোযোগিতা, মাদকদ্রব্য গ্রহণ, বিশৃঙ্খলার প্রতি এমন প্রবণতা একটি বিশ্বাসহীন প্রতিপালন ও সৃষ্টির নীতি লঙ্ঘনের ফল। কারণ, পাপ ও অপকর্ম হলো ধর্মহীনতার ফল, যা যুবকদের জীবনকে অনাকাঙ্ক্ষিত করে এবং সকলের জন্য কঠিন করে তোলে। সুতরাং বর্তমানে আধুনিক রাষ্ট্রগুলোতে যুবকদের বিষয়টি সবচেয়ে বড় সমস্যা– যা বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিতদের মন-মস্তিষ্ককে দখল করে আছে।

অপরাধ দমন ও অপরাধী নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক তৃতীয় জাতিসংঘ কংগ্রেস– যা স্টকহোমে হাজারো বিচারক, সমাজতত্ত্ববিদ ও পুলিশের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়, তা এক সপ্তাহ আলোচনার পর সমাপ্ত হয়। এই কংগ্রেসে বিশ্বের সকল দেশকে যুবকদের প্রতি কর্তব্যে অবহেলার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বলা হচ্ছে এবং এ ধরনের অপরাধ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে– যার কারণে বিশ্ব ক্লান্ত।[১]

দ্যা ন্যাশনাল ক্রাইম প্রিভেনশান কমিটি (কানাডা) বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৯১, জাতীয় অপরাধ প্রতিরোধ কমিটির বক্তব্য : '১৯৯১ সালে ১২০০০০০ শিশু দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করছে যাদের ৫০০০০০ হলো ৭ বছরের চেয়ে কম বয়সের এবং যাদের সর্বোচ্চ অপরাধ করার হার রয়েছে। এসকল শিশু অপরাধের পেছনে কারণ হলো পিতা-মাতার অমনোযোগিতা এবং আক্রমণাত্মক টিভি প্রোগ্রাম ও ছবি দেখা।'

১. ইত্তিলাত ডেইলি, নং ১১৭৬৫

'যেসব শিশু অতি উগ্র পরিবারে বেড়ে ওঠে তারা অন্যান্য পরিবারে বেড়ে ওঠা শিশুদের চেয়ে অধিক আত্মহত্যা করে। এই দলটি তাদের সমবয়সীদের তুলনায় অধিক যৌন বিশৃঙ্খল এবং আমেরিকার ৭৬% অপরাধী শিশু এমন পরিবারে বেড়ে উঠেছে।'

'৬৩% পিতা যারা তাদের ১১ থেকে ২০ বছর বয়সী সন্তানদের হাতে নিহত হয়। তার কারণ হলো এসব সন্তান তাদের বাড়িতে মারপিটের সাক্ষী ছিল, যেমন তাদের পিতারা তাদের মায়েদের প্রহার করত।'

১৯৯৩ সালে কানাডায় ন্যাশনাল অ্যাডভাইজরি কাউন্সিল ফর দ্যা স্ট্যাটাস অব উইমেন বলে : 'প্রতি ১৭ মিনিটে কানাডায় একজন নারী যৌন হেনস্থার শিকার হন এবং ২৫% কানাডিয়ান নারী তাদের জীবনে একবার যৌন হেনস্থার শিকার হন, যেখানে ৫০% লাঞ্ছনাকারী হলো কানাডিয়ান সমাজের তথাকথিত সম্মানিত বিবাহিত পুরুষ এবং ৪৯% হেনস্থার ঘটনা দিনের বেলায় ঘটেছে। ৮০% লাঞ্ছিতা নারী ১৪ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে।'

'১৯৯৩ সালে ২৬.৮% কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি ও কলেজের ছাত্রীরা ছাত্রদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছিল এবং ১৩.৬% ঘটনা মদ্যপ অবস্থায় ঘটেছিল।

তিনজনের মধ্যে একজন নারী এবং ছয় জনের মধ্যে একজন পুরুষ যৌন আক্রমণের শিকার হয়েছিল ১৮ বছর দ্বারা এবং ৯৮% অপরাধী ছিল যুবক।

মহানবী (সা.) ও যুবকশ্রেণি

যুবকরা সহজাতভাবেই সত্য, ধার্মিকতা ও মুক্তিকে পছন্দ করে। তাই তারা সঠিক ও ভালো কিছু করার জন্য খুবই আগ্রহী। তারা এগুলো করায় আনন্দ বোধ করে এবং সবসময় ধার্মিকতা ও ঐশী মূল্যবোধ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে যখন তাদের কথা ও কর্মকে সঠিক ও সত্য মূল্যবোধের ওপর ভিত্তিশীল করার চেষ্টা করে।

যুবকরা যখন দেখে যে, অন্যরা সঠিক পথ অনুসরণ করছে না তখন তারা দুঃখ পায় এবং মানুষকে অসৎকর্ম করতে দেখে কষ্ট পায়। তারা আরো চিন্তা করে যে, তাদের উচিত এমন অসৎকর্ম প্রতিরোধের শক্তি অর্জন করা। যখন মহানবী (সা.) প্রকাশ্যে

ইসলামের দাওয়াত দেন তখন যারা প্রথমে তাঁকে অনুসরণ করে তারা ছিল যুবক। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এসকল যুবক কুরাইশ গোত্রের প্রখ্যাত, ধনী ও স্বনামধন্য পরিবারের সন্তান ছিল।

যেসকল যুবক পশ্চাদপদ আরব জাতির শোচনীয় অবস্থা ও অজ্ঞতার যুগের বাতিল কুসংস্কার চর্চায় ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল তারা মহানবী (সা.)-এর আধ্যাত্মিক মুক্তির আহ্বানকে উষ্ণভাবে স্বাগত জানিয়েছিল।

মহানবীর মূল্যবান বাণী জীবনের সব ক্ষেত্রের জন্য ফলপ্রসূ ছিল, কিন্তু যুবকরা অন্যদের তুলনায় অধিক আগ্রহ প্রকাশ করে। মহানবীর বাণী তাদের অভ্যন্তরীণ চিন্তায় নাড়া দেয় এবং তাদের চেতনাকে প্রতিপালন করে। কোরআন শিক্ষা দেয়া ও ইসলামিক শিক্ষা প্রচারের জন্য যখন মহানবী (সা.)-এর বিশেষ প্রতিনিধি মুসআব ইবনে উমাইর মদীনায় পৌঁছেন তখন যারা তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের মধ্যে বয়স্কদের চেয়ে যুবকরাই অধিক সংখ্যক ছিল। মুসআব ছিলেন আসআদ ইবনে যুবাইরের বাড়িতে। দিনের বেলায় তিনি খাজরায গোত্রের জমায়েত হওয়ার স্থানে যেতেন এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাতেন এবং অধিকাংশ যুবক তাঁর আহ্বানে সাড়া দিত।

জাহেলিয়াতের যুগের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুবকদের সংগ্রাম

যেভাবে আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে, মহানবীর মূল্যবান বাণী যুবকদের ওপর বিরাট প্রভাব ফেলেছিল, এমন মাত্রায় যে, তারা তাদের ধর্মের ও ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতিরক্ষা করত সকল সময়ে এবং সকল স্থানে এবং জাহেলিয়াতের কুসংস্কারকে প্রতিহত করত।

সাদ বিন মালিক ছিলেন ইসলামের প্রথম যুগের একজন ধৈর্যশীল মুসলিম যুবক। তিনি ১৭ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সর্বত্র ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁর বিশ্বাস এবং জাহেলি মতাদর্শের বিরোধিতাকে প্রকাশ করেন। এটার কারণে মূর্তিপূজারিরা তাঁকে নির্যাতন করত। নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যুবকরা দিনের বেলা মক্কার পাহাড়ে নামায আদায় করতেন যাতে কুরাইশ কাফেররা তাঁদেরকে দেখতে না পায়।

একদিন কুরাইশদের একটি দল কতিপয় যুবককে ইবাদতরত দেখতে পায়। তারা তাদের বিদ্রূপ করতে থাকে এবং তাদের ধর্মবিশ্বাসকে অপমান করতে থাকে।

সাদ বিন মালিককে এটি খুব রাগান্বিত করে। তিনি উটের একটি হাড় নিয়ে একজন কাফিরের মাথায় এমন জোরে আঘাত করেন যে, তার মাথা ফেটে রক্ত পড়া শুরু হয়। এটি ইসলামের প্রতিরক্ষায় প্রথম রক্ত ঝরানো।

অপর একটি উপলক্ষে সাদ বলেন : "আমি আমার মাকে খুব ভালোবাসতাম এবং তাঁর প্রতি খুব দয়াশীল ছিলাম। যখন তিনি আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি বুঝতে পারলেন তখন তিনি আমাকে বললেন : 'হে পুত্র! এটি কোন্ ধর্ম যা তুমি গ্রহণ করেছ? তুমি তা পরিত্যাগ কর এবং মূর্তিপূজক হিসেবে থেকে যাও, অন্যথা আমি মৃত্যু পর্যন্ত খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করব না।'"

সাদ, যিনি তাঁর মাকে খুব ভালোবাসতেন তিনি তাঁর মাকে ভদ্রভাবে ও দয়ার সাথে বললেন : 'আমি আমার ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করব না এবং আমি তোমাকে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বারণ করছি।' কিন্তু তাঁর মা তাঁর কথায় কোন মনোযোগ দিলেন না এবং সারা দিন না খেয়ে কাটালেন। তিনি ভেবেছিলেন সাদ তাঁর ধর্মবিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবেন, কিন্তু তিনি উল্টো তাঁকে বললেন : 'আমি আল্লাহর নামে শপথ করছি, যদি তোমার হাজার আত্মা থাকে এবং তুমি একে একে সব হারাও, তবুও আমি আমার ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করবন না।' যখন তাঁর মা বুঝতে পারলেন যে, সাদ কোন অবস্থাতেই তাঁর ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করবেন না তখন তিনি আবার খাবার খাওয়া শুরু করলেন।[১]

সাদ জাহেলি যুগের প্রাধান্য বিস্তারকারী চিন্তা-চেতনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং অন্য যুবকরা তাঁর সাথে যোগ দিয়েছিলেন এবং তাঁরা মূর্তি চূর্ণ করেছিলেন, মন্দির ধ্বংস করেছিলেন, অত্যাচারের মূলোৎপাটন করেছিলেন এবং সত্য, জ্ঞান, ধার্মিকতা, নৈতিক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে একটি নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা সবচেয়ে অনগ্রসর জাতিকে আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিক মূল্যবোধের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত করেন।

১. উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯০

যুবকদের রাষ্ট্রীয় কর্মসংস্থান

উন্নত দেশগুলোতে যুবকদেরকে সম্মান প্রদর্শন ও তাদের মূল্যকে স্বীকার করা হয় যখন তাদের অসাধারণ শক্তিকে কাজে লাগানো হয়। স্পর্শকাতর রাষ্ট্রীয় কর্মের ক্ষেত্রে তাদের ওপর আস্থা রাখা হয় এবং দেশ ও জাতির স্বার্থে তাদের যৌবনশক্তিকে কাজে লাগানোর বহু উদাহরণ রয়েছে।

চৌদ্দ শতাব্দী আগে ইসলামের মহান নেতা এই গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দিকের প্রতি মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ, স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল রাষ্ট্রীয় কার্যে মূল্যবান যুবশক্তিকে নিয়োগ করেছিলেন এবং কথা ও কাজ দ্বারা তাদের সমর্থন করেছেন।[১]

এমন আচরণ তৎকালীন অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগে মেনে নেয় কঠিন ছিল। কারণ, বয়স্করা যুবকদের অনুসরণ করতে ইচ্ছুক ছিল না। যখন মহানবী (সা.) একজন যুবককে একটি উচ্চ পদে নিয়োগ দিলেন তখন বয়স্করা হতাশ হয়ে পড়ল এবং তাঁর কাছে প্রকাশ্যে অভিযোগ করল। তাঁর পরিবারের নিকট প্রথম দাওয়াত দেয়ার সময়ও এমন ঘটনা ঘটেছিল।[২]

মহানবী (সা.) সবসময় তাঁর চর্চাকে সুসংহত করতে উদ্বুদ্ধ করতেন এবং অজ্ঞ কুসংস্কার ও মিথ্যা মতবাদকে প্রতিরোধ করতেন। তিনি অবশেষে তাঁর জ্ঞানী বক্তব্য ও প্রতিনিয়ত স্মরণের দ্বারা মানুষকে প্রভাবিত করেন অথবা তাদের বলার কিছুই ছিল না। উপরন্তু, তিনি মিম্বার থেকে যুবকদের প্রয়োজনীয়তাকে প্রশংসা ও সমর্থন করতেন এবং তাদেরকে উচ্চ অবস্থানে প্রতিষ্ঠা করতেন।

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব

১. দার মাকতাবে আহলে বাইত [আহলে বাইতের মাযহাব], ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৭; ওয়াসায়েলুশ শিয়া, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২৫

২. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২; আল কামিল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০; মুসনাদে আহমাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১১; শারহে নাহজুল বালাগা, ইবনে আবিল হাদীদ, ১৩তম খণ্ড, পৃ. ২১০

যেসব যুবক মৃত্যু পর্যন্ত মহানবী (সা.)-এর পাশে থেকে তাঁর খেদমত করেছেন তাঁদের অন্যতম হলেন হযরত আলী। তিনি সকল কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং মহানবী (সা.)-এর একজন প্রিয়ভাজন ব্যক্তি ছিলেন এবং ইসলামের শুরু থেকে তিনি এর সৈনিক হিসেবে কাজ করেন।

আলী ইবনে আবি তালিব আরবের সবচেয়ে বড় ও অভিজাত গোত্র কুরাইশের বংশের ছিলেন। তাঁর মা ফাতিমা বিনতে আসাদ ইবনে আবদে মানাফ বনি হাশিমের একজন মহিয়সী নারী ছিলেন। সুতরাং আলী মাতা ও পিতা উভয় দিক থেকেই হাশিম বঙশোদ্ভূত ছিলেন।[১]

আলী অলৌকিকভাবে কাবা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। এটি এমন একটি অনুগ্রহ যা অন্য কেউ পায় নি। তিনি তিন দিন কাবা ঘরে ছিলেন এবং এরপর মায়ের কোলে বের হয়ে আসেন।[২]

হযরত আলীর পিতা আবু তালিব মহানবী (সা.)-এর আট বছর বয়স থেকে তাঁর অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ইসলামের কঠিন পরিস্থিতিতে মহানবী (সা.)-কে প্রতিরক্ষা করেন, যখন সকলে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। নবুওয়াতের দশম বর্ষে আবু তালিব ও মহানবী (সা.)-এর স্ত্রী হযরত খাদিজা ইন্তেকাল করেন। এই বছরটি 'শোকের বছর' নামে প্রসিদ্ধ।[৩]

যখন আলী একজন বালক ছিলেন, তখন মহানবী (সা.) তাঁকে নিজ বাড়িতে নিয়ে যান। আলী মহানবী (সা.)-এর বাড়িতে ও তাঁর তত্ত্বাবধানে বড় হয়ে ওঠেন।

হিরা পর্বতের গুহায় জিবরাইল (আ.) মহানবী (সা.)-এর নিকট নিজেকে প্রকাশ করলে এবং তাঁকে নবী হিসেবে ঘোষণা দিলে মহানবী (সা.) বাড়ি ফিরে যান এবং আলীকে ওহীর ব্যাপারে অবহিত করেন। বালক হওয়া সত্ত্বেও হযরত আলী

১. তারিখে আম্বিয়া [নবিগণের ইতিহাস], ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬; বিহারুল আনওয়ার, ৩৫তম খণ্ড, পৃ. ৬৮; শারহে নাহজুল বালাগা, ইবনে আবিল হাদীদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬

২. মুসতাদরাকে হাকেম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৩; কিফায়াতুত তালিব, পৃ. ২৬০; আল গাদীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২

৩. উসুলে কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৮; আল গাদীর, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৩০; বিহারুল আনওয়ার, ৩৫তম খণ্ড, পৃ. ৬৮-১৮৩

ইসলামের দাওয়াত কবুল করেন এবং তিনিই ছিলেন পুরুষদের মধ্যে প্রথম মুসলমান।[১]

নবুওয়াতে অভিষিক্ত হওয়ার পর মহানবী (সা.) তিন বছর তা প্রকাশ্যে প্রচার করেন নি। তৃতীয় বর্ষে তিনি মহান আল্লাহ কর্তৃক তাঁর নবী বলে ঘোষিত হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য নির্দেশিত হন এবং তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনের কাছে প্রথম দাওয়াত দেন। তিনি তাদেরকে একটি ভোজসভায় দাওয়াত করেন যে সভায় তিনি বলেন : ' হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানগণ! আল্লাহ আমাকে সকল মানুষকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য প্রেরণ করেছেন এবং বিশেষ করে আমার আত্মীয়-স্বজনকে এবং আমাকে বলেছেন : 'প্রথমে তোমার নিকট আত্মীয়দেরকে আল্লাহকে অস্বীকার করার বিষয়ে সতর্ক কর।'[২]

তিনি আরো দুই বার এ কথাকে পুনরাবৃত্তি করেন, কিন্তু একমাত্র আলী ছাড়া অন্য কেউ তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয় নি যখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র তের। মহানবী (সা.) বলেন : 'হে আলী! তুমি আমার ভাই, ওয়াসি, উত্তরাধিকারী ও উজির।'[৩]

আলী কর্তৃক মহানবীর বিছানায় শোয়ার ঝুঁকি গ্রহণ

নবুওয়াতের ১৩তম বর্ষে কুরাইশ নেতারা মহানবী (সা.)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে লোককে নির্বাচিত করা হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, তারা দলবদ্ধভাবে এক রাত্রিতে মহানবীর ওপর আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করবে। মহানবী (সা.) তাদের শয়তানি পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর আলীকে তাঁর বিছানায় শোয়ার জন্য বলেন যাতে শত্রুরা ঘরে মহানবীর অনুপস্থিতি সম্পর্কে কিছু বুঝতে না পারে।

---

১. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১২; আল গাদীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২৬; বিহারুল আনওয়ার, ৩৮তম খণ্ড, পৃ. ২৬২; ইহকাকুল হাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫৩

২. সূরা আল বাকারা : ২১৫; তাফসীরে ফুরাত, পৃ. ১১২

৩. ইহকাকুল হাক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৪৯; বিহারুল আনওয়ার, ৩৮তম খণ্ড, পৃ. ২৪৪; মানাকিবে ইবনে শারহে আ'শুব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮০; কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৯৭

তখন আলীর বয়স ছিল ২৩ বছর। তিনি মহানবীর কথায় ইতিবাচক সাড়া দেন এবং তাঁর বিছানায় ঘুমান। মহানবী (সা.) শহর পরিত্যাগ করে মক্কার নিকটবর্তী সাওর গুহায় আশ্রয় নেন। রাতের শেষে চল্লিশজন ষড়যন্ত্রকারী মহানবীর গৃহে তল্লাশি চালায় এবং আলীকে মহানবীর বিছানায় ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পায়।[১]

অনুবাদ : সরকার ওয়াসি আহম্মেদ

(চলবে)

১. ইহকাকুল হাক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬ ও ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৭৯; বিহারুল আনওয়ার, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ৬০; সিরাতে হালাভীয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬

সাম্প্রতিক বিশ্ব

ইয়েমেনে সৌদি জোটের অব্যাহত গণহত্যা ও অবরোধঃ কোথায় জাগ্রত মুসলিম ও বিশ্ববিবেক?

ইয়েমেনে সৌদি জোটের অব্যাহত গণহত্যা ও অবরোধঃ কোথায় জাগ্রত মুসলিম ও বিশ্ববিবেক?

এম এ হুসাইন

ইয়েমেনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে সাড়ে তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে আগ্রাসন চালিয়ে আসছে পশ্চিমা মদদপুষ্ট সৌদি জোট। যে সৌদি আরবে গণতন্ত্র, বাক-স্বাধীনতা ও ধর্মীয়-স্বাধীনতা বলতে কিছুই নেই এবং মানবাধিকার বলতেও বাস্তবে তেমন কিছুই নেই সেই রাজতান্ত্রিক সৌদি সরকার ২০১৫ সালের ২৫ মার্চ থেকে দারিদ্রপীড়িত ইয়েমেনে আগ্রাসন চালিয়ে আসছে!

ইয়েমেনবিরোধী সৌদি জোটের শরিক আরব দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিশর, সুদান ও কয়েকটি ক্ষুদ্র দেশ। ইয়েমেনের ওপর এই দেশগুলোসহ গোটা পাশ্চাত্য ও তাদের মিত্র দেশগুলো চাপিয়ে দিয়েছে কঠোর নিষেধাজ্ঞা। এমনকি তারা জাতিগুলোর অধিকার রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতিসংঘকেও ব্যবহার করছে ইয়েমেনের বিরুদ্ধে! ইয়েমেনের বিপ্লবী সরকারের ওপর নিষেধাজ্ঞা ও অবরোধ কার্যকরের নামে এসব শক্তি ইয়েমেনের যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষকবলিত অঞ্চলের জনগণের কাছে খাদ্য ও জরুরি ত্রাণ সরবরাহেও বাধা দিচ্ছে।

ইয়েমেনের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সৌদি আরবের কাছে পশ্চিমা দেশগুলো প্রতি বছর বিক্রি করছে হাজার হাজার কোটি ডলারের গণবিধ্বংসী ও এমনকি নানা ধরনের নিষিদ্ধ অস্ত্র। এসব অস্ত্রের নির্বিচার প্রয়োগে হতাহত হয়েছে হাজার হাজার বেসামরিক ইয়েমেনি নাগরিক। হতাহতদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। বিয়ে-বাড়ির জনসমাবেশ, শোক সমাবেশ ও শিশুদের স্কুল-বাসও রেহাই পাচ্ছে না নির্বিচার সৌদি গণহত্যার মেশিন হিসেবে ব্যবহৃত বিমান হামলা থেকে। ইয়েমেনের বিপুল সংখ্যক শিশু হত্যায় সৌদি রেকর্ডের কারণে জাতিসংঘ সৌদি সরকারকেও শিশুঘাতক সরকারগুলোর কালো তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছিল। কিন্তু সৌদি সরকার জাতিসংঘকে

চাঁদা ও সাহায্য দেয়া বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দেয়ায় জাতিসংঘ শিশুঘাতক সরকারগুলোর তালিকা থেকে সৌদি সরকারের নাম প্রত্যাহার করে নেয়। একই ধরনের কারণে জাতিসংঘ দখলদার ইহুদিবাদী ইসরাইলকেও শিশুঘাতক সরকারগুলোর তালিকাভুক্ত করতে সাহস করছে না।

সৌদি জোটের নির্বিচার বিমান হামলায় ধ্বংস হয়ে গেছে ইয়েমেনের বেশিরভাগ জরুরি বেসামরিক অবকাঠামো, যার মধ্যে রয়েছে কোনো কোনো বিমানবন্দর, আবাসিক বাড়ি, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, কল-কারখানা, খাদ্যগুদাম, বাজার, মসজিদ, বিদ্যুৎ ও পানি-সরবরাহ কেন্দ্রের মতো জরুরি নানা প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা। আগ্রাসন ও অবরোধের শিকার ইয়েমেনে দেখা দিয়েছে দুর্ভিক্ষ, মহামারি, ক্ষুধা ও অপুষ্টির মতো নানা প্রাণঘাতী সংকট। জাতিসংঘসহ নানা সংস্থার হিসাব মতে প্রায় প্রতি মিনিটে মারা যাচ্ছে অপুষ্টি ও কলেরা রোগসহ নানা রোগের শিকার একটি করে শিশু। বাড়ি-ঘরহারা আশ্রয়হীন শরণার্থীর সংখ্যাও হবে অন্তত অর্ধ কোটি। অন্যায় অবরোধের শিকার দরিদ্র এই দেশটির প্রায় অর্ধেকেরও বেশি মানুষ নিয়মিত খাদ্য ও জরুরি ওষুধ পাচ্ছে না।

ইয়েমেনে সৌদি আরবের আগ্রাসনে সর্বাত্মক মদদ যোগাচ্ছে দখলদার ইহুদিবাদী ইসরাইল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন। সৌদি আরবকে সামরিক, লজিস্টিক, রাজনৈতিক ও গোয়েন্দা তথ্যসহ সর্বাত্মক সমর্থন, সাহায্য ও সহযোগিতা করছে নব্য-উপনিবেশবাদী এই সরকারগুলো। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল ইয়েমেন যুদ্ধে সৌদি নেতৃত্বাধীন আগ্রাসী জোটের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবেও অংশগ্রহণ করছে।

সম্প্রতি মার্কিন দৈনিক নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স ইয়েমেনের নিরীহ জনগণকে হত্যায় আমেরিকার সরাসরি ভূমিকা রয়েছে বলে উল্লেখ করেছে। দৈনিকটি সৌদি আরবের কাছে আমেরিকার বিপুল পরিমাণ সমরাস্ত্র বিক্রির কথা উল্লেখ করে লিখেছে, ইয়েমেনে চালানো গণহত্যায় আমেরিকার হাত থাকার বিষয়টি এখন সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।

নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত দৈনিকটি এক নিবন্ধে আরো লিখেছে, আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া ইয়েমেনে সামরিক আগ্রাসন চালানো সৌদি আরবের পক্ষে সম্ভব নয়। নিবন্ধে বলা হয়েছে, মার্কিন সরকার কয়েক দশক ধরে সমরাস্ত্র বিক্রির জন্য সম্পদশালী কোনো দেশকে বেছে নিচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে ইয়েমেনের বেসামরিক

নাগরিকদের ওপর সৌদি আরবের চালানো গণহত্যা আমেরিকার সে নীতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

নিউ ইয়র্ক টাইমসের মতে, সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন জোট বিমান হামলা চালানোর ক্ষেত্রে বেসামরিক ও সামরিক এলাকাকে গুলিয়ে ফেলছে এবং তারা স্কুল ও হাসপাতালসহ বেসামরিক স্থাপনাগুলোয় নির্বিচারে বোমা হামলা চালাচ্ছে।

একইভাবে ব্রিটেন, ফ্রান্স, কানাডা, ইতালি, জার্মানি ও আরও কয়েকটি পশ্চিমা দেশের মারণাস্ত্র ব্যবহার করছে আগ্রাসী সৌদি বাহিনী।

ইয়েমেনে সৌদি জোটের আগ্রাসনের অজুহাত ও পটভূমি

ইয়েমেনের আপামর জনগণ, হুথি আন্দোলন ও জনপ্রিয় আনসারুল্লাহ আন্দোলনের নেতৃত্বাধীন জাতীয় কমিটি বা জাতীয় ঐক্যের সরকার ঐক্যবদ্ধভাবে ইয়েমেনে সৌদি জোটের আগ্রাসনের মোকাবেলায় প্রতিরোধ-যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। বিপ্লবী ইয়েমেনিরা সৌদি-মার্কিন-ইঙ্গ-ইসরাইলি-আমিরাতি আধিপত্যের কাছে নতজানু এবং ইঙ্গ-মার্কিন-সৌদি-ইসরাইলি অবৈধ স্বার্থ সংরক্ষণকারী বিশ্বাসঘাতক প্রেসিডেন্ট আব্দু রব্বিহ মানসুর আল হাদিকে গণ আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করলে ইয়েমেনে ইঙ্গ-মার্কিন-ইসরাইলি-সৌদি-আমিরাতি আগ্রাসন ও চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের সূচনা হয় ২০১৫ সালের ২৫ মার্চ।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ব্যাপক হামলা চালিয়েও সৌদি জোটের সেনারা ইয়েমেনের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত হুদাইদা বন্দর দখল করতে পারে নি। এই বন্দরই ইয়েমেনের একমাত্র সমুদ্র-বন্দর যা দিয়ে এখনও ইয়েমেনে কিছু কিছু ত্রাণ ও মানবিক সাহায্য পাঠানো সম্ভব হচ্ছে।

পদত্যাগী ও পালিয়ে যাওয়া হাদির সমর্থক-সেনা এবং হানাদার আগ্রাসী বাহিনীসহ সৌদির অনুচর আলকায়দা ও আইএস বা দায়েশের মতো তাকফিরি-ওয়াহাবি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে দক্ষিণ ইয়েমেনের বেশিরভাগ বা বিশাল অঞ্চল। মরুভূমি-প্রধান এ অঞ্চলে অবশ্য জনবসতি বা শহরের সংখ্যা খুবই কম। অন্যদিকে রাজধানী 'সান্আ'সহ উত্তর-ইয়েমেনের বেশিরভাগ অঞ্চলের ওপর রয়েছে জনপ্রিয় হুথি

আন্দোলনের নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক জোট ও দলগুলোকে নিয়ে গঠিত বিপ্লবী সরকারের কর্তৃত্ব। শিয়া হুথি আন্দোলন ও বিপ্লবী ইয়েমেন সরকারের বিপুল জনপ্রিয়তার অন্যতম বড় কারণ হল তারা মার্কিন, সৌদি ও ইসরাইলি আধিপত্যসহ বিজাতীয় আধিপত্যের কঠোর বিরোধী।

জনসমর্থনহীন প্রেসিডেন্ট হাদি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নাম কে ওয়াস্তের বা প্রহসনমূলক নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কারণ, ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আর কোন পদপ্রার্থী ছিল না। পদত্যাগের পরে মানসুর আল হাদি সৌদি আরবে পালিয়ে যান। যদি সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের মতো তাঁর জনসমর্থন থাকত তাহলে আনসারুল্লাহ কি তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারত?

আনসারুল্লাহর পক্ষে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইয়েমেনি জনগণ রয়েছে তার প্রমাণ হচ্ছে প্রায় চার বছর গত হয়ে যাওয়ার পরও সৌদি-মার্কিন-ইসরাইলি জোট ইয়েমেনে বিমান হামলা ছাড়া বড় ধরনের কোন সার্থক স্থল আক্রমণ চালাতে পারে নি। আর একারণে ক্রুদ্ধ হয়ে ইঙ্গ-মার্কিন-ইসরাইলি-সৌদি জোট ইয়েমেনের আপামর মজলুম জনগণের ওপর জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে এক ভয়ংকর অবরোধ আরোপ করেছে যার শিকার ইয়েমেনের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ। ইয়েমেনে জনসংখ্যা প্রায় ১৭ থেকে ২০ মিলিয়ন বা পৌনে দুই কোটি থেকে দুই কোটির মতো।

ইয়েমেন ইস্যুতে মুসলিম জাহানের নিষ্ক্রিয়তা ও পশ্চিমা শক্তিগুলোর দ্বিমুখী নীতি ইয়েমেনের জনগণ তীব্র খাদ্যাভাব এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ ও পানীয় জলের তীব্র ঘাটতির শিকার হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম বিশ্বের সরকারগুলোর কথা তো বাদই দিলাম, মুসলিম বিশ্বের বেশিরভাগ ইসলামি দল দরিদ্র ও যুদ্ধ-বিধ্বস্ত এই জনগোষ্ঠীকে রক্ষার জন্য কিছুই করছে না। ব্যতিক্রম হচ্ছে ইরান ও লেবাননের হিজবুল্লাহসহ পশ্চিম এশিয়ার গুটিকয়েক ইসলামি শক্তি।

সৌদি-মার্কিন-ইঙ্গ-ইসরাইলি জোটের প্রতিনিয়ত ও নির্বিচার বোমাবর্ষণে এ পর্যন্ত ১৪ হাজারেরও বেশি ইয়েমেনি শহীদ হয়েছে যাদের অর্ধেকই হচ্ছে শিশু ও নারী। অথচ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, যে কেউ একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করল সে যেন গোটা মানবজাতিকে হত্যা করল। আর যে একজন মানুষের জীবন রক্ষা করল সে যেন গোটা মানবজাতিকে রক্ষা করল। এখানে নিহত ব্যক্তি বা প্রাণে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিকে মুসলমান হতে হবে বলে কোনো শর্ত দেয়া হয় নি। ইয়েমেনের জনগণ কি

অপরাধ করছে যে, তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ ও গণহত্যা? শিয়া প্রাধান্যযুক্ত জনগোষ্ঠী, দরিদ্র ও স্বাধীনচেতা এবং কৌশলগত অঞ্চলের অধিবাসী হওয়াই কি তাদের অপরাধ?

তুরস্ক, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মিশর ও অন্যান্য অঞ্চলের সরকার আর কথিত ইসলামি দল বা আন্দোলনগুলো কি দেখছে না যে, নির্বিচার সৌদি বিমান হামলায় ইয়েমেনের সার্বিক অবকাঠামো সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে? দেশটির রাস্তা-ঘাট, স্কুল, হাসপাতাল, জনগণের বাড়ি-ঘর, কল-কারখানা, ক্ষেতখামার সব ধ্বংস করে দিচ্ছে শয়তানি সৌদি-ইঙ্গ-মার্কিন-ইসরাইলি জোট বিমান।

সুপেয় পানির অভাবে ইয়েমেনে কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়ে হাজার হাজার ইয়েমেনির মৃত্যু হয়েছে। মনে হচ্ছে এই শয়তানি জোট অবৈধ সৌদি-মার্কিন-ইসরাইলি আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকারী ইয়েমেনি জাতিকে যেন ধ্বংস করে দিতে চাচ্ছে। তাই এটা স্পষ্ট যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ইসরাইলও সৌদি আরবের সাথে ইয়েমেন আক্রমণে শরীক এবং আগ্রাসী পক্ষ হিসেবে এই সরকারগুলোর হাতও ইয়েমেনের জনগণের রক্তে রঞ্জিত।

কাতার, মালয়েশিয়া ও আরও কয়েকটি মুসলিম দেশ ইয়েমেন যুদ্ধে সৌদি জোটের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলেও বাংলাদেশ সরকার এখনও ইয়েমেনে সৌদি জোটের প্রতি নৈতিক সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে!

পশ্চিমা সরকারগুলো মানবাধিকারের বুলি আওড়িয়ে থাকলেও তারা যেমন মিয়ানমার, বসনিয়া, আফ্রিকা, ফিলিস্তিন, ইরাক ও কাশ্মীরে মুসলমানদের ওপর গণহত্যা ঠেকানোর জন্য কোনো উদ্যোগই নেয় নি তেমনি তারা এখনও ইয়েমেনের জনগণকে রক্ষার জন্য কিছুই করছে না। এর কারণ ইয়েমেনের প্রাকৃতিক সম্পদ, খনিজ সম্পদ ও দেশটির সংলগ্ন কৌশলগত বাবুল মান্দাব প্রণালির ওপর রয়েছে তাদের প্রলুব্ধ দৃষ্টি! এ ছাড়াও অস্ত্র ব্যবসা বহাল রাখার জন্য তারা ইয়েমেনে

যুদ্ধের আগুন জিইয়ে রাখছে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটকে দিয়ে। সিরিয়া ও ইরাকের মতো ইয়েমেনকেও তারা কয়েক টুকরো করতে চায়।

পশ্চিমাদের অস্ত্র ব্যবসা ইয়েমেনে যুদ্ধ বন্ধের প্রধান অন্তরায়

পশ্চিম এশিয়ায় নব্য-উপনিবেশবাদী পাশ্চাত্য ও ইহুদিবাদী ইসরাইলের স্বার্থ রক্ষার জন্য ইসলামের লেবাস পরিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে আলকায়দা ও দায়েশের মতো নানা ধরনের তাকফিরি-ওয়াহাবি সন্ত্রাসী দল। পশ্চিমা মদদপুষ্ট এইসব দল সিরিয়া ও ইরাকে ব্যর্থ হওয়ার পর এখন তাদের পরাজিত ও পালিয়ে যাওয়া সদস্যরা বিশ্বের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে এবং নিজ নিজ অঞ্চলে ফিরে যাচ্ছে। এসব সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর জন্য পশ্চিমা অস্ত্র কিনে দিয়েছিল সৌদি, আমিরাত ও কাতার সরকারের মতো কয়েকটি আরব সরকার। ইয়েমেনিদের ওপর আমিরাত ও সৌদির বিমান হামলায় ব্যবহার করা হচ্ছে মার্কিন এফ-সিক্সটিন জঙ্গি বিমান। এসব বিমান থেকেও ফেলা হচ্ছে পশ্চিমাদের দেয়া নিষিদ্ধ গুচ্ছ বোমা, ফসফরাস বোমা, আগুনে বোমা ও নানা ধরনের রাসায়নিক বোমা।

সমরাস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সংস্থা নামের একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান নিরপরাধ ও বেসামরিক ইয়েমেনি জনগণের ওপর সৌদি বিমান হামলা চলতে থাকায় এই দেশটির কাছে অস্ত্র বিক্রি করতে নিষেধ করেছিল মার্কিন, ব্রিটিশ ও ফরাসি সরকারকে। কিন্তু অস্ত্র বিক্রির আন্তর্জাতিক নীতিমালা লঙ্ঘন করে এই তিন সরকার সৌদি আরবের কাছে অস্ত্র বিক্রি অব্যাহত রেখেছে। তাই সমরাস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সংস্থা এই তিন সরকারের বিবেকহীন ও অমানবিক অস্ত্র-ব্যবসার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।

ব্রিটিশ সরকার ২০১৫ সালের মার্চ মাস থেকে গত বছর পর্যন্ত সৌদি সরকারের কাছে যুদ্ধবিমান, বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র বাবদ প্রায় সাড়ে তিনশ কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্র বিক্রি করেছে। অথচ দেশটির বেশিরভাগ জনগণ মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী ও অগণতান্ত্রিক সৌদি সরকারের কাছে অস্ত্র বিক্রির বিরোধিতা করে নিয়মিত বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল করে আসছে। ব্রিটেনের যুদ্ধ ও অস্ত্র-ব্যবসার বিরোধী সংগঠনগুলো সৌদির কাছে অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করার দাবি জানিয়ে গণ-বিক্ষোভ মিছিলের

আয়োজন করে আসছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে মুসলিম দেশগুলোতে এ ধরনের বিক্ষোভ খুব কমই দেখা যাচ্ছে। কথিত বহু ইসলামি দলও এ ব্যাপারে নীরব রয়েছে, বরং বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামীর মতো একটি দল ইয়েমেন ইস্যুতে সৌদি সরকারকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে!

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বা এআই সৌদি আরবের কাছে ব্রিটিশ অস্ত্র বিক্রির নিন্দা জানিয়ে বলেছে, ব্রিটিশ সরকারও ইয়েমেনের গণহত্যায় ও যুদ্ধ-অপরাধে সৌদি সরকারের শরিক হিসেবে কাজ করছে। ফ্রান্স ও জার্মানিকেও এই একই অপরাধের শরিক বলা যায়। এআই জানিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর কাছে বিক্রি করা জার্মান অস্ত্র সন্ত্রাসী ওয়াহাবি গোষ্ঠী দায়েশের সদস্যদের হাতে দেখা গেছে।

মার্কিন সরকার মধ্যপ্রাচ্যে সৌদি অপরাধযজ্ঞের সবচেয়ে বড় সহযোগী

তবে সৌদির কাছে অস্ত্র বিক্রিতে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছে মার্কিন সরকার। মার্কিন সরকার ২০১৫ সালে সৌদির কাছে বিক্রি করেছে দুই হাজার কোটি ডলারেরও বেশি মূল্যের অস্ত্র। ওই একই বছর ব্রিটেন সৌদির কাছে বিক্রি করেছে চারশ' কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্র। ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর সৌদি আরবের কাছে মার্কিন অস্ত্র বিক্রির পরিমাণ অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। ট্রাম্প তাঁর প্রথম বিদেশ সফরের স্থান হিসেবে বেছে নেন রিয়াদকে। সেখানে

তিনি ১১ হাজার কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রির এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। দশ বছরের মধ্যে মার্কিন সরকার এই চুক্তির আওতায় সৌদির কাছে ৩৫ হাজার কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি করতে পারবে বলে সমঝোতা হয়। এভাবে ইয়েমেনের নিরপরাধ বেসামরিক জনগণের ওপর জাতিগত নির্মূল অভিযান বা গণহত্যা ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধসহ যুদ্ধ-অপরাধ চাপিয়ে দেয়া এবং সেখানে দায়েশসহ নানা সন্ত্রাসী দলগুলোকে অস্ত্রে সজ্জিত করার অপরাধে জড়িত হয়েছে মার্কিন সরকার।

ইয়েমেনের জনগণের জন্য যখন দরকার খাদ্য ও চিকিৎসা সামগ্রীসহ নানা ধরনের ত্রাণ সাহায্য তখন মার্কিন ও পশ্চিমা সরকারগুলো সেখানে গণহত্যা জোরদারের জন্য সৌদি সরকারের কাছে পাঠাচ্ছে অস্ত্র। অক্সফাম নামের একটি সংস্থার অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান আনা ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মতো পশ্চিমা সরকারগুলো সৌদির কাছে যেসব অস্ত্র পাঠাচ্ছে সেসব অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে ইয়েমেনের আবাসিক ভবনসহ বেসামরিক এলাকায়।

এটা স্পষ্ট, পশ্চিমাদের অস্ত্র ব্যবসার প্রতিযোগিতা ও সীমাহীন লোভের কাছে পণবন্দি হয়ে গেছে ইয়েমেনের জনগণ। শান্তি ও মানবাধিকারের ব্যাপারে পশ্চিমা সরকারগুলোর বুলি কেবলই পরিহাস।

সৌদি সরকারের পাপের পেয়ালা উপচে পড়ছে পাশবিক ও নৃশংস পাপাচারে! চূড়ান্ত পরাজয় অনিবার্য সৌদি সরকার গত দুই বছরে ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানি, কানাডা ও মার্কিন সরকারের কাছ থেকে কিনেছে ৭০ হাজার কোটি ডলারেরও বেশি অস্ত্র। হজযাত্রীদের দেয়া অর্থ ও আল্লাহর দেয়া তেল সম্পদের অপব্যবহার করে সৌদি সরকার পশ্চিমা অস্ত্র কিনে হত্যা করছে ইয়েমেনের নিরপরাধ নারী, পুরুষ ও শিশুদেরকে এবং ধ্বংস করছে ইয়েমেনের স্কুল, মসজিদ ও হাসপাতাল। মুসলমানদের প্রধান দুই পবিত্র কেন্দ্র মক্কা ও মদিনার দখলদার এবং ওয়াহাবিপন্থী হওয়ার দাবিদার সৌদি সরকার নিজ দেশের জনগণের ওপরও চালাচ্ছে হত্যাযজ্ঞ ও দমন-পীড়ন। এমনকি মক্কা ও মদিনার অনেক বিখ্যাত ওয়াহাবি আলেমও সম্প্রতি সৌদি যুবরাজ মুহাম্মাদ বিন সালমানের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কারণে গুম বা নিখোঁজ হয়েছেন। তাঁদেরকে হত্যা করা হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। জামাল খাশোগি নামক ভিন্ন মতাবলম্বী এক সৌদি সাংবাদিককে যুবরাজের নির্দেশে হত্যা করা হয়েছে। এই খবর বিশ্বব্যাপী সৌদি যুবরাজের জন্য নিন্দার উৎসে পরিণত হয়। অবশ্য ইহুদিবাদী ইসরাইল এই ঘটনার নিন্দা জানায় নি, বরং এ ঘটনার কারণে সৌদি সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করা উচিত নয় বলে মন্তব্য করেছে!

জামাল খাশোগি প্রখ্যাত সৌদি ধনকুবের আদনান খাশোগির ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। সৌদি এই সাংবাদিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছিলেন। তিনি ইয়েমেনে সৌদি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ও বর্তমান সৌদি সরকারের নানা নীতির সমালোচনা করে লেখালেখি করছিলেন বলে যুবরাজ তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। খাশোগি সৌদি গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে এক সময় যোগাযোগ রাখতেন বা তাদের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাই তিনি সৌদি সরকারের অনেক গোপন তথ্য ফাঁস করে দিতে পারেন বলে সৌদি সরকার আশঙ্কা করছিল। খাশোগি তাঁর কোনো এক বন্ধুকে এ তথ্য দিয়েছিলেন যে, ব্রিটেনে ইরান সরকারের বিরোধী কথিত যে ন্যাশনাল টিভি চালু করা হয়েছে তা চালু করা হয়েছে সৌদি সরকারের অর্থে। নানা মিডিয়া এ খবর প্রচার করায় খাশোগির ওপর ক্ষুব্ধ হন সৌদি কর্তৃপক্ষ। ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসের ২ তারিখে খাশোগি

তুরস্কের ইস্তাম্বুলে সৌদি কনস্যুলেটে গেলে সেখানে তাঁকে আটক করে হত্যা করা হয় এবং তাঁর দেহকে জীবন্ত অবস্থায় অথবা অজ্ঞান করে অথবা হত্যার পর ইলেট্রিক করাত দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে পরে অ্যাসিডে গলিয়ে ফেলা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। অথচ এর আগে সৌদি যুবরাজের নির্দেশে সৌদি আরবের প্রখ্যাত শিয়া আলেম শেইখ নিমারকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলেও বিশ্ব-সমাজ এ নিয়ে তেমন কোনো নিন্দা বা প্রতিবাদ জানানোর দরকার মনে করে নি! জানা গেছে যুবরাজ নিজে তাঁকে জল্লাদের মাধ্যমে হত্যার আগে তাঁর হাত-পা ভেঙ্গে দিয়েছিলেন! শেইখ নিমার সৌদি সরকারের ইসলামবিরোধী নানা তৎপরতা এবং শিয়া মুসলমানদের ওপর বৈষম্য ও নির্যাতনের নিন্দা করছিলেন বলে প্রহসনমূলক এক বিচারে তাঁকে হত্যা করা হয়। এর আগে ও পরে সৌদি আরবের তেলসমৃদ্ধ পূর্বাঞ্চলের শিয়া-প্রধান শহরগুলোতে চালানো হয় ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ও দমন-অভিযান। এখনও এ অঞ্চলে মাঝে মধ্যেই চালানো হচ্ছে দমন-অভিযান।

ইরাক ও সিরিয়ায় তাকফিরি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোকে বিপুল অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সহায়তা দিয়ে এসেছে সৌদি সরকার। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানসহ বিশ্বের নানা অঞ্চলে উগ্র ওয়াহাবি গোষ্ঠীগুলোকেও অর্থ দিয়ে থাকে সৌদি সরকার। ইরানের সরকার বিরোধী মুনাফিক (কথিত এমকেও বা মুজাহিদিনে খালক) গোষ্ঠীসহ নানা বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকেও অর্থ ও অস্ত্র দিচ্ছে সৌদি সরকার। জানা গেছে সৌদি সরকার বিশ্বব্যাপী ওয়াহাবি মতবাদ ছড়িয়ে দেয়ার জন্য যত অর্থ খরচ করেছে মার্কিন বা সোভিয়েত সরকারও তাদের মতবাদ প্রচারের জন্য তত অর্থ খরচ করে নি! সিরিয়া ও ইরাকে সৌদি বিনিয়োগ ব্যর্থ হওয়ার পর এখন ইয়েমেনেও সৌদি সরকারের জন্য চরম পরাজয় অপেক্ষা করছে।

প্রায় ৫ বছর ধরে ইয়েমেনে নির্বিচার হামলা চালিয়েও সৌদি জোট ইয়েমেনের রাজধানীসহ প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলো দখল করতে ব্যর্থ হয়েছে। ইয়েমেনিদের প্রতিরোধ হামলায় নিহত হয়েছে সৌদি জোটের বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় সেনা-কর্মকর্তাসহ হাজার হাজার সেনা ও তাদের ভাড়াটে অনুচর। ইয়েমেনিদের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও সাম্প্রতিক সময়ের ড্রোন হামলা সৌদি জোটের জন্য বড় ধরনের বিপর্যয় হয়ে দেখা দিয়েছে। সৌদি জোট চূড়ান্ত পরাজয় ও চরম অসম্মান এড়াতে চাইলে এখনই ইয়েমেনের চোরাবালি থেকে তার বেরিয়ে যাওয়া উচিত বলে সামরিক

পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন। এর আগে গত শতকের ৭০, ৮০ ও ৯০-র দশকেও ইয়েমেনের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে পরাজিত হয়েছিল সৌদি আরব ও মিশরসহ বাইরের শক্তিগুলো।

ইয়েমেনের আনসারুল্লাহ বাহিনীর ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন প্রযুক্তিকে ইরানের সরবরাহ করা বলে প্রচার করছে ইয়েমেনের শত্রুরা। কিন্তু বাস্তবতা হল ইরান ইয়েমেনে ত্রাণ সাহায্য পাঠাতেও সক্ষম হচ্ছে না কঠোর অবরোধ ও নিষেধাজ্ঞার কারণে। বহু কষ্টে মাঝে মধ্যে কিছু ত্রাণ সাহায্য পাঠাতে সক্ষম হয়েছে মজলুমের সমর্থক ইসলামি এই দেশটি। ইয়েমেনে অনেক আগ থেকেই বিপুল ক্ষেপণাস্ত্র মজুদ ছিল। ইয়েমেনিরা এইসব ক্ষেপণাস্ত্রকে উন্নত ও দূরপাল্লার করতে সক্ষম হয়েছে এবং এক্ষেত্রে বাইরের তাত্ত্বিক বা পরামর্শগত সহায়তা থাকতেও পারে। ইয়েমেনের ড্রোন প্রযুক্তি লাভের ক্ষেত্রেও বাইরের তাত্ত্বিক বা পরামর্শগত সহায়তা থাকতে পারে।

ইয়েমেনের আনসারুল্লাহ বাহিনীর ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন প্রযুক্তিকে ইরানের সরবরাহ করা বলে প্রচার করছে ইয়েমেনের শত্রুরা। কিন্তু বাস্তবতা হল ইরান ইয়েমেনে ত্রাণ সাহায্য পাঠাতেও সক্ষম হচ্ছে না কঠোর অবরোধ ও নিষেধাজ্ঞার কারণে। বহু কষ্টে মাঝে মধ্যে কিছু ত্রাণ সাহায্য পাঠাতে সক্ষম হয়েছে মজলুমের সমর্থক ইসলামী এই দেশটি। ইয়েমেনে অনেক আগ থেকেই বিপুল ক্ষেপণাস্ত্র মজুদ ছিল। ইয়েমেনিরা এইসব ক্ষেপণাস্ত্রকে উন্নত ও দূরপাল্লার করতে সক্ষম হয়েছে এবং এক্ষেত্রে বাইরের তাত্ত্বিক বা পরামর্শগত সহায়তা থাকতেও পারে। ইয়েমেনের ড্রোন প্রযুক্তি লাভের ক্ষেত্রেও বাইরের তাত্ত্বিক বা পরামর্শগত সহায়তা থাকতে পারে।

দুঃখজনক বিষয় হল ইয়েমেন সংকটের ব্যাপারে পশ্চিমা শক্তিগুলো ও তাদের মিত্র শক্তির নিয়ন্ত্রিত প্রচারমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থাগুলো সঠিক তথ্য প্রচার করছে না। তবে সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হল মজলুম ইয়েমেনিদের প্রতি সহায়তা ও সমর্থন দেয়ার ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের বেশিরভাগ সরকার, রাজনৈতিক দল, আলেম সমাজ, বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ ও জনগণের উদাসীনতা বা নির্লিপ্ততা বরং জালিম সৌদি জোট ও তাদের মদদদাতাদের প্রতি সমর্থনের হীন মানসিকতা। মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজার ধরে রাখার জন্য অনেক সরকার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইয়েমেনের মজলুমদের প্রতি সমর্থন না দিয়ে আগ্রাসী শক্তিগুলোকেই সমর্থন দিচ্ছে। আর এ থেকে আধুনিক যুগের সরকারগুলোর হীন স্বার্থকেন্দ্রিকতা ও বিবেকহীনতাই ফুটে উঠছে।